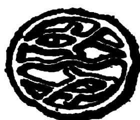
পূর্ব্ব কথা

প্রসন্নময়ী দেবী

সম্পাদনা : নির্ম্মাল্য আচার্য

গ্রন্থ-পরিচিতি : অমলেন্দু ঘোষ



সুবর্ণরেখা

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৭

দাম ১২. টাকা

প্রচ্ছদপট : বিমল মজুমদার

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯
মুদ্রাকর : আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৬

উৎসর্গ।

মা, তুমিই জীবন্ত "পূর্ব্ব কথা", তবুও আবার আমি তাহা কাগজ কালি কলমে লিখিয়া তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া শ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম।

'তারাবাস'
২রা জানুয়ারী,
১৯১৭।

প্রণত কন্যা
প্রসন্নময়ী।



প্রসন্নময়ী দেবী

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আমাদের গ্রামের আদি নাম কি তাহা জানি না ও এক্ষণে জানিবারও কোন উপায় নাই। স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী পিতৃষসাগণ এখন লোকান্তরে, কুলপুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগেরও বংশলোপ হইয়াছে। শিবরাত্রির সলিতার মত যে দু'-একজন আছেন, তাঁহারা ইংরাজীনবিশ, সুতরাং অতীতকথা অতীত, স্মৃতির সহায়ে যাহা মনের মধ্যে তোলপাড় করে তাহাই লিখিতেছি।

আমার পূর্ব্বপুরুষ শাক্ত, পূজা হোম বলি তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। "হরি মৈত্র ও মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ চৌধুরী"* চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রামের নাম "হরিপুর" রাখিয়াছিলেন। আমার পিতৃগৃহ এখনও সেই স্মৃতিময় হরিপুরেই। তাহার পূর্ব্বের সব ভগ্নাবশেষ এযুগেও আমাদের নিকট তেমন মর্ম্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ।

হরিপুরের মত সুন্দর পল্লীগ্রাম এ জীবনে আর কখনো দেখি নাই — আমিও পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু এমন "শস্য-শ্যামলা" এমন দীর্ঘ ঘন পরিপুষ্ট পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী, এমন নিবিড় বনরাজি শুষ্কপ্রায় "কদমতলী" এমন "বিল কুড়ুলে" এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কাচবৎ স্বচ্ছ "বড়াল" নদী এ জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না।

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা, পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, ধারাজল বিনে কভু
মিটে কি চাতকের তৃষা?"

সাতশ ঘর চৌধুরী এবং দুশ আড়াইশ ঘর কুটুম্ব যে গ্রামের শোভা ছিল, কলরবে যেস্থান মুখরিত থাকিত, এখন সেখানে পোড়োবাড়ী, জঙ্গুলে ভিটে ব্যতীত শতাধিকও জনপদ নাই। তবুও তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ও সৌন্দর্য মনকে পরিতৃপ্ত ও দ্রবীভূত করে। প্রবাসের রঙ্গালয় অপেক্ষা নিজের দেশের শ্মশান ভাল। সেখানে কত স্নেহের কত প্রাণের কত আশার জিনিস ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তথাপি সে পুণ্যক্ষেত্র দর্শনে মনপ্রাণ জুড়াইয়া যায় ও শান্তির পথে অগ্রসর হয়। বর্ত্তমানের এ শোকসন্তপ্ত জীবন যদি আবার সেই বাল্য সুখের পল্লী জীবনের সহিত বিনিময় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর একদিনও এ সভ্যতা বিড়ম্বিত মহানগরীতে থাকিতাম না। আবার সেই সোনার গাঁয়ে চলিয়া যাইয়া স্নেহের স্মৃতির মধ্যে বাকী অংশটা কাটাইয়া দিতাম।

* যাদবানন্দ চৌধুরী সাধারণের নিকট "যাদু কীর্ত্তনে" নামে আজিও পরিচিত।

পূর্ব্বে ইংরাজী পড়া চলিত ছিল না। পার্শী, সংস্কৃত ও বাংলা পড়া গ্রাম্য পাঠশালায় হইত। আমরা গ্রামের বড় তরফ, পিতামহদেব বংশের বড়ছেলে, সেইজন্য প্রত্যহ আমাদের তরফেই নৈশ বিদ্যালয় বসিত। মিঞা সাহেব তাহার শিক্ষকতা করিতেন। শুনিয়াছি রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, পিতৃদেব ও অন্যান্য আত্মীয়গণ সকলে মিলিয়া সমস্বরে "আলব, বে, তে, সে" পড়িতেন। এখন যেমন ইংরাজী কবিতা মুখস্থ করা নিয়ম, তখন তেমান পার্শী বয়দ, হাফিজ, সাদি কণ্ঠস্থ করান হইত। পাঁচ বৎসরে বালকের হাতে খড়ি ও সেই হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কুলপুরোহিত "নামশ্লোক" অর্থাৎ পিতৃমাতৃ-কুলের দ্বাদশ পুরুষের নাম শিক্ষা দিতেন এবং চাণক্য পণ্ডিতের হিতোপদেশ মুখে মুখে পড়াইতেন। আর ভূগোল স্বরূপ প্রথমে গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম, জিলা, পরগণা, তাহার লোকসংখ্যা, জাতি, গোত্র, গাঁই ও বিবাহসূত্রে কে কাহার কুটুম্ব শিখান হইত। তাহার পর মহকুমা ও আদালতের কাছারী যেখানে রাজস্ব জমা দিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেন। যে বালক এইসকল বিষয়ে শীঘ্র দক্ষ হইয়া উঠিত, তাহাকে কাছারী বাড়ীতে প্রত্যহ প্রাতে তালপত্রে লেখা শেখান হইত।

আমার পিতৃদেব ৺দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁহার জন্মস্থান নাটোরের রাজবাড়ী। মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবী* এবং আমার পিতামহী দুই সহোদরা ভগ্নী। নাটোরের অনতিদূরে ইসলামগাঁতি গ্রামের রায় মহাশয়েরা অতি প্রতাপশালী দুর্দ্দান্ত জমীদার ছিলেন। শুনিয়াছি, রাম রায়, রুদ্র রায়ের ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। তাঁহাদিগেরই ঘরের এই দুইকন্যা। মহারাজা রায় বিশ্বনাথ বাহাদুর দুইজনকেই বিবাহযোগ্য রূপে মনোনীত করেন। আমার পিতামহী কুমারী দেবী জ্যেষ্ঠা ও দয়াময়ী দেবী কনিষ্ঠা। দুইজনই অপূর্ব্ব সুন্দরী। তবুও দুই ভগিনীর মধ্যে একটু বর্ণের তারতম্য ছিল, কুমারী দেবীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চননিভ ছিল না, একটু শ্যামাভাযুক্ত ও ওষ্ঠাধরে একটী ক্ষুদ্র তিল থাকায় নিখুঁত রূপবতী দয়াময়ীকেই মহারাজা বাহাদুর বিবাহ করিলেন। আর কুমারী দেবী আমাদিগের গরীব ব্রাহ্মণের গৃহ আলো করিয়া ধনে, পুত্রে, স্বামীপ্রেমে লক্ষ্মীশ্বরী হইলেন।

আমরা কাপ ও মৈত্র, নবাব-প্রদত্ত উপাধি চতুর্দ্ধুরীণ ও বহু বংশপরম্পরায় ঐ খেতাব চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষিপ্ত আকারে চৌধুরী পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

রাজসাহী জেলার হরিপুর, কাশিমপুর ও নালোর এই তিন গ্রামের কাপ কুলীনের সমকক্ষ কিম্বা পদগৌরবে কুলীন অপেক্ষা উচ্চ। কত কুলীনের কুলভঙ্গ

* মহারাণী কৃষ্ণমণির পিতৃদত্ত নাম দয়াময়ী, মহারাজা বিশ্বনাথ বাহাদুর বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী থাকায় বিবাহ পরে, বালিকা পত্নীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়া কৃষ্ণমণি নামকরণ করিয়াছিলেন।

করিয়া কন্যাগণের বিবাহ দিয়া অনেকেই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন তথাপি "কুলকার্য্য" ছাড়েন নাই। এইক্ষণেও সামাজিক লৌকিকতায় ও ভোজন দক্ষিণায় নিরাবিল কুলীনের সমান মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। আমাদের আসমুদ্র বারেন্দ্রসমাজ, কোথায় কাশী, আর কোথায় বিক্রমপুর, মৈমনসিং, রাজসাহী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে ভরপুর, তবুও সে সমাজে কুলীন পাত্র পাওয়া বড় কঠিন ছিল, তাহাতেই জমিদারী লিখিয়া দিয়া, বহু অর্থ ব্যয়ে কুলীনে কন্যাদান করিতে হইত। আমার পূর্ব্ব পুরুষরাও এই কুলীনে কন্যাদান করিতে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হন। আমার পিতামহ ৺কালীকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ৺করুণাময়ী দেবী; তাহার পর প্রথম পুত্র ৺কালীকিশোর চৌধুরী* (রামকৃষ্ণ অন্নপ্রাশনের নামে) ও দ্বিতীয় পুত্র গৌরমোহন এবং ক্রমে চারি কন্যা ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ দুর্গাদাস। পূর্ব্বকালে তীর্থযাত্রা এক মহা সমস্যার ব্যাপার ছিল, ঠাকুর দাদা ৺কালীকান্ত চৌধুরী উইল করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের গুপ্ত ধন মৃত্তিকাতল হইতে উঠাইয়া সপরিবারে নৌকাযোগে কাশী দর্শনে যান ও সেখানে দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ চৌদ্দ বৎসরের পুত্র গৌরমোহনের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে অতীব শোকাকুল অবস্থায় সেখান হইতেই দেশে ফিরিয়া আইসেন। তখন মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবী, জ্যেষ্ঠার এই পুত্র শোকের সান্ত্বনা দিবার জন্য নাটোর রাজধানীতে তাঁহাকে আনাইয়া অতি যত্ন আদর করেন এবং সেখানেই আমার পিতৃদেবের জন্ম হয়। পূর্ব্বকালে পুরাতন ঘরের এবং রাজবাড়ীর প্রথানুসারে পিতৃদেবের জন্মের পূর্ব্বে বালুঘটিকা সম্মুখে আচার্য্য ও গণৎকারগণ গণনায় দেখিয়াছিলেন যে, যে সন্তান জন্মিবে সে অতি ভাগ্যবন্ত হইবে। মাতার প্রসব বেদনার কথা শুনিয়া আমার পিতৃষসাগণ, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়াছিলেন "আয় ভাই আমরা এখন লুকাইয়া শয়ন ঘরে যাইয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকি, এখনি মায়ের একটা মেয়ে হইবে আর ঠাকুরাণী মাসীমা (মহারাণী কৃষ্ণমণি) ও মামীমারা সব কাঁদাকাটি করিবেন।" এমন সময় আমার পিতৃদেব শুভক্ষণে শুভলগ্নে ভূমিষ্ঠ হইলেন ও শঙ্খ রবে এবং হুলুধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতুলানীরা এত বাড়াবাড়িরূপে হিন্দুয়ানীর আচার বিচার মানিয়া চলিতেন যে শূদ্রের ছায়া মাড়াইবার ভয়ে, প্রাঙ্গণে বাহির হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণী পরিচারিকা দ্বারা শূদ্রদিগকে সরাইয়া দিতেন। তাঁহারাই ভাগিনেয়ের জন্ম শুনিয়া, একেবারে সূতিকাগৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন। সোণার ক্ষুরে শিশুর নাড়ী কাটাইয়া মহারাণীর আদেশানুসারে "সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর" বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাহা পুতিয়া রাখা হইল। "সর্ব্বমঙ্গলার" কৃপায় পুত্রশোকের শান্তিস্বরূপ এই শিশুর জন্ম মনে করিয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাহার নাম দুর্গাদাস রাখা তখনি স্থির হইয়া গেল।

* জ্যাঠা মহাশয়ের রাশি নাম কালীকিশোর, আদত নাম রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহারাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুরের নাম বলিয়া নাটোরে ঐ নামে পরিচিত ছিলেন।

পিতৃদেবের এগার মাস বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহ দেবের আটত্রিশ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে এই অকাল মৃত্যুতে রাজসাহী জেলার চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া যায়। তিনি অসাধারণ সুন্দর, ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ জমীদার ছিলেন। তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ ও নিঃস্বার্থ প্রজাপালনের কথা আজিও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুশোকে আত্মীয় বন্ধু চাকর দাসী ও প্রজাগণের মনে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে দেশের লোকে বলিতে লাগিলেন— "এমন একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল; এমন দিক্‌পাল স্বামীর মৃত্যু হইল, কিন্তু সাধ্বী রামকৃষ্ণের মায়ের কান্নার শব্দ কেহ শুনিল না। এমন সংযম, এমন ধৈর্য্যশীলা সতীলক্ষ্মী এ অঞ্চলে নাই।"

পিতামহ দেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যেন অলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। আজ এটা বিক্রী, কাল ওটা বন্ধক, এইরূপে দারুণ ঋণজালে জড়িত হইয়া, কতক জমিদারী রক্ষার্থে পিতৃদেবের খুল্লতাত ৺কমলাকান্ত চৌধুরী ছোট কর্ত্তা, তাঁহার ভগিনীপতি লাহিড়ী মহাশয়ের নামে সম্পত্তি সব বেনামী করিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে দুচারি কথা এখানে বলিব। পূর্ব্বে লাহিড়ী মহাশয় সাত কাহন কড়িতে গোমস্তাগিরি কাজ করিতেন। কৌলীন্য মর্য্যাদাবশতঃ আগে পিতৃদেবের পিসিমাতার সহিত বিবাহ হয়, ও তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার বৃদ্ধ বয়সে, আমার পিতৃষ্বসা ৺মৃণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। উপযুক্ত ঘর না পাওয়ায় পিতামহী দেবী বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন। পিসিমাতাকে বিবাহ করিবার পর মোক্তারী করিয়া তিনি ক্রমে ধনবান হইতে লাগিলেন ও আমাদিগের সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাঁহার হস্তগত হওয়ায় তিনি তখন রাজসাহী জেলার মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। সূর্য্যাস্ত আইনের কল্যাণে কত রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর তাঁহার ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পাঁচ হাজারের স্থানে দশ হাজার দিয়া জমিদারী রক্ষা করিতেন এবং তাহাতেই তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া আমাদিগের সুবর্ণ অঙ্গদের ন্যায়, "সোনাবাজু পরগণা" কায়েমী বন্দোবস্ত চেষ্টায় আত্মবিস্মৃত হইলেন। পিতৃদেব ক্ষুদ্র বালক, জ্যেষ্ঠতাত সৌখীন বাবু। সে কালের দস্তুরে মাথায় বাবরি চুল, দন্তে মিশি, বিশ টাকার ধুতির পাড় ছিঁড়িয়া পরেন, (পাড়ে তাঁহার অঙ্গে ব্যথা লাগিত!) প্রস্তরে খোদিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, উদার প্রকৃতি, যাহা কিছু পাইতেন, পরদুঃখে কাতর হইয়া চক্ষের জল সহ দিয়া দিতেন। বিষয় কর্ম্মে কখনো মনোনিবেশ করিতেন না। পিতামহী দেবী তাঁহাকে এজন্য ভর্ৎসনা করিলে বলিতেন, "দম্ ফুরাইলে বুক কাহার? সর্ব্বস্ব তুরুকে লউক, তাহাতে আমার এ স্বভাব আর যাইবে না। ইল্লত যায় ধুলে আর স্বভাব যায় ম'লে।" এত যে সংসার অচল তথাপি রাজসাহীতে থাকিয়া ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার বয়স্য প্রিয় পিতৃব্য বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ চিঠি লিখিয়াছিলেন—"সেতার বাজালে

কিছু হয় না, জমিদারী নিলাম হয়ে যায়; বাবু সেতার বাজায় সেতার বাজালে কিছু হয় না। অন্নাভাবে কাঁদে মা,তেল পান না পিসি, বাব্‌রি নেড়ে চল্‌ছেন, বাবু, দন্তে দিয়ে মিশি।" এই কবিতাপত্রে জ্যেষ্ঠতাত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত হইল না। গৃহদেবতা শ্যামরায় ঠাকুরের বাড়ীতে তেমনি নৈশ মজলিস বসিতে লাগিল,এবং অক্ষক্রীড়া, গান বাদ্য পূর্ব্ববৎ সমারোহে চলিল,—এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভগ্ন হৃদয় ছোট কর্ত্তা সম্পত্তির শোকে গঙ্গা লাভ করিলেন।

আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কন্যাগণ বড় সুন্দরী, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও ততোধিক তেজস্বিনী। বাল্যকালে কোন অবাধ্যতা করিলে জেঠিমাতা রাগিয়া বলিতেন, "কাপের মেয়ে সাপেও খায় না, এম্নি তেজ।" সকলেই অল্প বিস্তর ধনবানের কন্যা, কুলীন পাত্রে পরিণীতা হইয়া আশৈশব পিতৃগৃহবাসিনী, শ্বশুরালয়ের মুখ কখনও দেখিতেন না। কাজেই ভয় কাহাকে বলে তাঁহারা জানিতেনও না।

বিশেষতঃ আমার পিতৃষসাদিগের রূপগুণে বারেন্দ্র সমাজ আলোকিত ছিল। কোনও ধনবানের গৃহদেবতা প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঠাকুরাণীজি তৈয়ার করিবার জন্য ভাস্করকে আমাদিগেরি গৃহে পাঠান হইত—এ জনশ্রুতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত।

একে পিসে মহাশয় বৃদ্ধ, তাহাতে পিসিমাতা অপূর্ব্ব সুন্দরী ও দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার" প্রভাবে বেনামীর সমস্ত কাগজ পত্র অযাচিতে তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট বেদ পুরাণের মত ছিল। পিতৃদেব দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মাতৃহীন হইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে ভগিনীর নিকট থাকিয়া রাজসাহী কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, এবং তাহার পূর্ব্বে পার্শী, উর্দ্দু এবং বাংলা পড়িয়াছিলেন। আমাদের বংশে কেহ কখনও ইংরাজী পড়েন নাই ও সরকারী চাকুরী করেন নাই। পিতৃদেবই প্রথমে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া সেকালের ইংরাজীনবিশ ও সরকারী চাকুরী গ্রহণে বৈবাহিকগণের নিকটে "হলধর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষকেরা যেমন প্রাতে "বাসিপান্তা" যাহাই পায় খাইয়া লাঙল কাঁধে মাঠে যায়, তিনিও তেমনি অর্দ্ধ ভোজনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হংসপুচ্ছ চালনা করিতে কাছারী যাইতেন, তাই "হলধর" পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সতের আঠার বৎসর বয়সে পিতৃদেব জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১১ টাকা বৃত্তিসহ ঢাকা কলেজে পড়িবার অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু আমার তৃতীয় পিতৃষসা ৺ মৃণ্ময়ী দেবী সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রাধিক প্রিয়তর ভ্রাতাকে নির্ব্বান্ধব স্থানে পাঠাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ৺ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব কলিকাতার ছোট আদালতের জজ) তখন রাজসাহী কলেজের হেড মাষ্টার ছিলেন, ও পিতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি মধ্যস্থ হইয়া কলিকাতা

হিন্দুকালেজে পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বৃত্তিটি বন্ধ হইয়া গেল। সে সময়ে আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয়. লাহিড়ী মহাশয়ের মাসহারায় সকলের দিনপাত হইত ; পিতৃদেবের কলিকাতায় পাঠের খরচ কিরূপে চলিবে ভাবিয়া বাড়ীতে সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। আগেই বলিয়াছি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কন্যাগণ অতীব তেজস্বিনী, ইহাতে পিসিমা ৺ মৃণ্ময়ী দেবী বড় উত্তেজিত হইয়া স্বামীকে যাইয়া বলিলেন "আমার পৈতৃক সম্পত্তি চোখে ধূলি দিয়া অমনি বেনামিতে ভোগ করিতেছ, আর আমার ভাইয়ের খরচাভাবে লেখাপড়া বন্ধ হইবে—এ কিরূপ ন্যায় বিচার ? যদি আমার ভাইয়ের পাঠের ব্যয়ভার তুমি বহন না কর, আমার সমস্ত স্ত্রীধন ও অলঙ্কার তাহাকে লেখা পড়া করিয়া দিব, তাহাতে তুমি কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও এ অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করিব না।" পিসে মহাশয় বড় গোল ও বেগতিক দেখিয়া পিতৃদেবের কলিকাতার মাসিক খরচ দিতে অগত্যা স্বীকার হইলেন।

তখন পিতাঠাকুরের কলিকাতা যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুটুম্ব কৃষ্ণনাথ সান্যাল ও অবৈতনিক বিশ্বস্ত ভৃত্য বংশপরম্পরায় চাকরাণে প্রতিপালিত কিশোর দাসের সঙ্গে যাওয়া স্থির হইল।

তখনকার দিনে রাজসাহী হইতে নৌকা যোগে কলিকাতা গমনাগমন যে কত বিপদসঙ্কুল তাহা এদিনে বুঝান বড় শক্ত। পথে পদে পদে লুটেরা ডাকাত, রাহাগির ও ঠগী জীবন হাতে করিয়া পথ চলিতে হইত। পিতৃদেব যখন যাওয়া আইসা করিতেন, পান্‌সীর মাঝি মাল্লারা সম্মুখে চিড়ে গুড় ও পিত্তল কলসীতে জল লইয়া দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত নৌকা বাহিয়া যাইত এবং ক্ষুধা পাইলে ঐ সব খাইত মাত্র। আর ভৃত্য কিশোর বন্দুকে গুলি পুরিয়া বসিয়া পাহারা দিত।

পিতৃদেব যৎকালে প্রবাস যাত্রা করিলেন তখন বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। স্নেহময়ী পিসিমারা ভ্রাতার নিরাপদে পৌছার সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। তারের সমাচার সে সময়ে প্রচলিত ছিল না, ডাকের চিঠিই সপ্তাহে একদিন মাত্র আসিত। পত্র আসিবার দিন তাঁহারা প্রত্যুষ হইতে "দুর্গানাম জপ" করিতেন, দৈবাৎ যদি কোনবার পত্রের গোল হইয়া যাইত তাঁহারা একেবারে অন্নজল ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা রোদন করিতেন। একমনে নারায়ণের মস্তকে লক্ষ তুলসীপত্র দিয়া সহোদরের মঙ্গল প্রার্থনায় শান্তি স্বস্ত্যয়নে নিরত থাকিতেন। পিতৃদেব জেলেপাড়া ভবানীপুরে বাসবাড়ী স্থির করিয়া হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইলেন। প্রত্যহ পদব্রজে কলিকাতা কলেজে পড়িতে যাইতেন। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র ও আষাঢ়ের বৃষ্টি মস্তকের উপর দিয়া অবাধে চলিয়া যাইত, তাহাতে শরীর ও মনে কোন ক্লেশ বোধ করিতেন না। ট্রামগাড়ী সে সময়ে ছিল না এবং অশ্বযানের অর্থাভাব সুতরাং এ কষ্ট তাঁহার অনিবার্য্য। চিরসম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত বলিয়া লক্ষ্মীর কৃপায় দারিদ্র্য দুঃখ কাহাকে বলে

জানিতেন না। প্রতিদিন আহারান্তে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহার কখন অভ্যাস থাকা দূরে থাকুক কল্পনাও করেন নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তন সহ যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে জন্য একদিনের নিমিত্ত পশ্চাৎপদ কিম্বা দুঃখিত হন নাই। অক্লান্ত ভাবে দৈনিক পড়াশুনায় নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্ব্বে বেতন ভোগী ব্রাহ্মণের হস্তের রন্ধন খাইলেও "জাতে পতিত" হইতে হইত সে কারণ প্রতি ধনীর গৃহেও গৃহিনীর রন্ধন প্রথা ছিল, বিদেশে তাহা আর কি প্রকারে হইবে? যেদিন সান্যাল কাকার অসুখ করিত সেদিন পিতৃ-ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইয়া কলেজে যাইতে হইত। তাঁহাকে রন্ধন করিতে দেখিয়া পার্শ্বের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কৌতুকচ্ছলে ডাকিয়া বলিত "বলি ও ছোট বৌ, তোর রান্না কেন এগোয় না, এত দেরি, তুই বড় অকর্ম্মা।"

অমানুষিক ধৈর্য্য এবং চরিত্রবলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিয়ম মত মা সরস্বতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়া কলেজের শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ও সহপাঠীদিগের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাপ্তান রিচার্ড-সনের শিষ্যবর্গ সকলেই সেক্ষপিয়ারে পারদর্শী এবং তাঁহার কবিতা কণ্ঠস্থ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে কলেজের ছাত্র সভায় তাহার অভিনয় হইত। তৎকালে "প্রবোধচন্দ্রোদয়" বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক ছিল। একালের ন্যায় সর্ব্ব বিষয় পাসের নিয়ম ছিল না। যে কয়েকটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতেন তাহাতেই পাস হইয়া উপাধি পাইতেন। তিনিও গণিত ভিন্ন অন্য সব বিষয় পাস করিয়া "সিনিয়ার" নাম পান।

বৎসরান্তে পূজার ছুটীতে পিতৃঠাকুর যখন বাড়ী যাইতেন তখনকার সে বিপদের কথা এক একটা কাহিনীর মত। চারি পাঁচবার ডাকাইতের হাতে পড়িয়া প্রভুভক্ত ভৃত্য কিশোরের সাহায্যে বাঁচিয়া যান। একবার শিবনিবাসের চুর্নীনদীতীরে আহারাদির নিমিত্ত নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করেন এমন সময় ভদ্রলোকের আরোহী নৌকা দেখিয়া ঘাটের লোকেরা বড় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকে। নদীয়ার গড়োগোয়ালারা সব ডাকাত এবং জমীদারের জ্ঞাত-সারেই এ কার্য্য করিত। ডাকাতেরা দিনে গৃহস্থ ব্যক্তির মত নদীতীরে বসিয়া থাকিত, যমদূত বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না। পিতার পান্‌সী নৌকাতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি দেখিয়া ডাকাতেরা নৌকায় আগুন লইতে আসিতে লাগিল, ঐ একটা সঙ্কেত,—ও ক্রমে একে একে দুচার জন নৌকায় আসিয়া তাঁহার আসবাব সকল দেখিয়া যাইতে ছিল। তখনি সুচতুর কিশোরদাসের বন্দুকে গুলিপোরা হইল ও সে অতি সন্তর্পণে কাণ্ডখানা কি, কেন এত লোক সমাগম তাহা দেখিবার জন্য তীরে নামিয়া গেল। নামিয়া ঘাটের অশ্বত্থ গাছের তলায় কালীবাড়ী পৌঁছিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে একেবারে অজ্ঞান হইয়া

যাইবার কথা। কিন্তু অসীম সাহসী কিশোর বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া অতীব ভয়ঙ্কর কাণ্ড সব দেখিতে লাগিল। কালীর বাড়ী একটু নির্জ্জন স্থানে ও শ্মশান প্রাঙ্গণে অবস্থিত এবং সেই গৃহের অভ্যন্তরে ভয়ানক মূর্ত্তি কালীমাতা দণ্ডায়মান; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিন্দুর ও বলির রক্তে রঞ্জিত, লোল জিহ্বা শোণিত পিপাসায় লক্ লক্ করিতেছে, ঘরে বন্দুক তলোয়ার লাঠি সোটা, বর্শা, বল্লম খড়্গ ঢাল টাঙ্গী এবং অসংখ্য নির্ব্বাপিত মশাল ও এক-কোণে প্রকাণ্ড এক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। মূর্ত্তিমান যমরূপী ডাকাতেরা সব কাল রঙে দেহ রঞ্জিত করিয়া এবং মুখে সিন্দুর লেপিয়া এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল। হায়! প্রায় শতাধিক লোক এই কার্য্যে ব্যাপৃত। রাত্রে নৌকা লুট করিয়া যে সকল মূল্যবান দ্রব্য পাইবে, এবং বাবুকে কালীর চরণে বলি দিবে, তাহার কৌতুকাবহ আলোচনায় অট্টহাস্য করিতেছে। এই ভয়াবহ দৃশ্যে কিশোরদাস হতবুদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইয়া নৌকায় যাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল,—"ছোট বাবু আর রক্ষা নাই, জীবন্ত যম সব সম্মুখে, আর খাওয়া দাওয়া না, নৌকা ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিন। এবার আপনাকে বাঁচাইতে পারিলাম না। ডাকাত, ডাকাত, এখনি মারিয়া ফেলিবে।" ইহা শুনিয়া সান্ন্যাল কাকা কম্পবান্ কলেবর ও পিতৃদেব নির্ব্বাক্। তখনকার কালে ঐ সব নদীতে জোয়ার ভাটা খেলিত। তখন ভাটার সময়, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি বন্দুকের গুলি ফুরাইয়া গিয়াছে। উপায়ন্তর বিহীন অবস্থায় রন্ধনের আয়োজন চড়ায় অমনি ফেলিয়া মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া নির্ভীক পিতাঠাকুর স্থির চিত্তে পান্সীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অন্য আরো মহাজনী নৌকার বহর সেখানে ছিল; তাহারা বড় ভীত হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই সব নৌকার মাঝি মাল্লারা আহারের দ্রব্যাদি অমনি পড়িয়া রহিল দেখিয়া পিতাকে বলিতে লাগিল "ভয় কি কর্ত্তা, আমরা সব পূর্ব্ববঙ্গের লাঠিয়াল, এমন লাঠি চালাইব যে দলকে দল জখম হইয়া হটিয়া যাইবে। আমাদের লাঠির এক ঘা সহ্য করে এমন কেহ নাই। সেবা করুন (খান) এখনও সময় আছে, আল্লার দোয়ায় কোন হানি হইবে না।" নৌকার ডহরে ৬।৭০ খানা লাঠি লুক্কায়িত ছিল, দেখাইয়া আশা দিতে লাগিল। অন্নজল তবুও কাহারো মুখে উঠিল না। তাঁহারা সমস্ত ক্ষণ জোয়ারের প্রত্যাশায় নদীর দিকে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যদেব ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইলে অন্য নৌকার লোকেরা বিপদ বুঝিয়া ইহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিল। অত্যন্ত ব্যগ্রতা বশতঃ বান ডাকিবার আগেই পিতৃদেব নৌকা খুলিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। ভগবানের অনন্ত অসীম কৃপায় যেমন পান্সীর দড়ি মুক্ত হইল অমনি প্রবলবেগে জোয়ার আসিয়া পান্সীকে জোরে ভাসাইয়া মাঝ গাঙ্গে লইয়া ফেলিল। আর পশ্চাৎ হইতে মহাজনী নৌকার বহর কিছু না বুঝিয়াই ছুটিয়া আসিতে লাগিল। নদীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। শিকার অসময়ে হাত-

ছাড়া হইয়া পালাইতেছে দেখিয়া ডাকাতেরা দলে দলে "রি, রি" * "জয় মা কালী, জয় মা কালী" রবে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গালি দিতে দিতে ঘাটে আসিয়া পড়িল ও নৌকা ধরিবার জন্য ডিঙ্গীতে চড়িয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ; সেই মাঝি মাল্লার লাঠি ও কিশোরের ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজে ডাকাতেরা ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

শিবনিবাসের ঐ স্থান আগে ডাকাতের আড্ডা ও সংহারকালীর পীঠস্থান ছিল। পূজার সময় ঐখানে বহুবিধ নৌকা মারা যাইত ও নরহত্যা হইত। ইংরাজ রাজত্বের সুশাসনে সে সকল উৎপাত আর নাই। নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার নিকটে একটা স্থানে এক ভাই অজ্ঞাতে আর এক ভাইকে হত্যা করিয়া নৌকা লুঠিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। সেই হইতে সেই স্থানের ছোট শাখানদীর নাম "ভাইমারার খাল" হইয়াছে। পিতৃঠাকুর যখন চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের কার্য্যে ছিলেন, তখন আমাদিগকে এই সকল ডাকাইতের পুরাতন আড্ডা দেখাইয়াছিলেন। নরবলির হাড়-কাঠের চিহ্ন এক্ষণেও নাকি নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যভাবে আছে, এইরূপ জনরব।

রাজসাহীর কোন এক গ্রামে "গামছা মোড়ার দল" ছিল। তাহারা দিনেই ভদ্রলোক পথিক দেখিলে গলায় গামছা মোড়া দিয়া তাহাদিগকে মারিয়া যাহা কিছু পাইত লইয়া পলাইয়া যাইত। ক্রমশঃ তাহাদিগের অত্যাচারে লোকজনের পথে বাহির হওয়া মহা অনিষ্টজনক ও ভয়াবহ হইয়া উঠায় রাজপুরুষেরা ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া রাখালবালকগণের সাহায্যে শেষে দলপতিকে ধৃত করিয়া তাহাকে দলসহ দ্বীপান্তরিত করেন। সেই হইতে "গামছা মোড়ার দল" দেশ হইতে অন্তর্হিত।

এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় সাধারণতঃ ধনী সন্তানগণের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে কিন্তু পিতৃদেব আশৈশব এ প্রথার বিরোধী ও তিনি গুরুজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীয় মত বজায় রাখিয়া তাঁহাদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কত ধনবানের সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ আসিত। জ্যাঠামহাশয় অতীব ব্যস্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ স্থির করিতে চাহিতেন, পিতৃঠাকুর অমত প্রকাশ করায় নিরাশ হইয়া যাইতেন। জমিদারী পর হস্তগত, উপার্জ্জন কিছু নাই, লাহিড়ী মহাশয়ের মাসহারা সম্বল, এ অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত মনে করিয়া সে প্রসঙ্গ কাহাকেও তুলিতে দিতেন না। সকলের কথা ঠেলিতে পারিতেন, পিসিমাতাদিগের কথায় অবাধ্য হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁহারা পিতাকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে কেবল কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের যোগ্য পাত্রী পাইলে তাঁহারাই বিবাহ স্থির করিবেন এবং পূর্ব্বে পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইবেন। তাঁহাকে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রী মনে হইলে তিনি সে

* ডাকাতের সাঙ্কেতিক শব্দ।

ভাগ্যে থাকে বিষয় বিভব আবার হইবে। গুণবান্ সর্ব্বাংশে, এ অঞ্চলে এরূপ কার্য্য ত পূর্ব্বে কখন হয় নাই। এ কালের ন্যায় দেনা পাওনার সুদীর্ঘ ফর্দ্দ, টাকার হাঁক ডাক, অলঙ্কারের তালিকা, কিছুই হইল না। কেবল ৫১টী টাকা মাত্র "পণ" পাত্র মর্য্যাদায় শুভ পরিণয় স্থির ও সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

কোন কোন সুলক্ষণা কন্যার পিতৃগৃহ ত্যাগের পরে তাহাদের পরিবারে নানা রকম আপদ বিপদ দেখা দেয়। আমার মায়ের শ্বশুরালয়ে গমনের পর রায় মহাশয়দিগেরও গৃহে সেই প্রকার বিবিধ দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। তাঁহাদিগের গোষ্ঠীপতি ফকীরচাঁদ রায় ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, তিনি পলাসীর যুদ্ধের সময় পাঁচ ছয় বৎসরের বালক। রণবাদ্যের গল্প, সৈনিকের গঙ্গা পার, ইত্যাদির বিষয় শীতের সন্ধ্যাকালে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া বালক বালিকাগণের নিকট বলিতেন। তিনি রায় পরিবারের ধৃতরাষ্ট্র, জন্মান্ধ, ক্রূরনীতিজ্ঞ নহেন, অন্ধ এবং পরিণামদর্শী বৃদ্ধ। মানুষের এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে অন্যটীর শক্তি যেমন বাড়িয়া যায়, তাঁহারও তেমনি দৃষ্টির অভাবে শ্রবণ শক্তি অতীব প্রখর ছিল। পদ শব্দে লোক চিনিতেন। "ঠগীর হাঙ্গাম ও গামছা মোড়ার" অত্যাচার নিবারণ করিতে রায় বৃদ্ধের উপর সরকারী পরোয়ানা আইসে ও তিনি তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। সেই রাগে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে "গামছা মোড়া" স্বদলে রায় মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া আক্রমণ করে। সিপাই শাস্ত্রী ঘোড়সোয়ার এবং মশালের আলোকে চারিদিকে একটা হৈঃ চৈঃ পড়িয়া যায়। তখন অন্ধ রায়পতি শয়ন ঘর হইতে কাণ্ডখানা কি ভয়ঙ্কর বুঝিতে পারিয়া সেকালের ক্রীতদাসী অতি বিশ্বাসী রাসমণিকে ডাকিয়া গোপনে কি পরামর্শ দিয়া, অন্দর মহলের সমস্ত দুয়ার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দেন ও শয্যায় বসিয়া স্থিরচিত্তে "দুর্গানাম" জপে মনোনিবেশ করেন। মুক্তদ্বার পাইয়া দলের সর্দ্দার একেবারে অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে, অতি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং প্রবীণারা কেবল অন্তঃপুরে রহিয়াছেন ও রাসমণি প্রভৃতি ক্রীতদাসীরা একত্র মিলিয়া ইষ্টক, হাঁড়ি ও প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া মারিতেছে। পিতৃমাতৃ উচ্চারণে কুৎসিত গালি অপমান সূচক বাক্য স্ত্রী কন্যার নামে ঘৃণিত কথা বলিতেছে। রজনী প্রভাতোন্মুখ, "ফাঁড়িতে" অবশ্য সংবাদ পাঠান হইয়াছে, অচিরাৎ ধৃত হইবার ভয়ে ডাকাতেরা পলায়ন করিল। এদিকে বহুতর চৌকিদার সমভিব্যাহারে দারোগা, বক্সি আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। সে যাত্রা "গামছা মোড়া" রায় মহাশয়ের পরমাসুন্দরী কিশোরী বিধবা পুত্রবধূকে অপহরণ করিয়া তাঁহাদের চির অকলঙ্ক পবিত্র কুলে কালী দিতে আসিয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী অন্ধরাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া বালিকা বধূকে মলিন বস্ত্রে দাসীকন্যা সাজাইয়া কলসী কক্ষে খিড়কীর পথে জঙ্গলে পাঠাইয়া নিরাপদ করিতে রাসমণিকে পূর্ব্বেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। ফকিরচাঁদ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসর

মধ্যে রায়বংশ প্রায় লোপ হইয়া গেল। এই অভাবনীয় ঘটনায় ভাটুরা এবং রাখাল বালকে ছড়া বাঁধিয়া ঘাটে মাঠে গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত, আর তাঁহার প্রজাগণ শুনিয়া হাহাকার করিত।

"ফকিরচাঁদ রায় বুড়ে
যমের দুয়ার জুড়ে
আছিল পড়ে একশ পাঁচ,
তাঁহারি পুণ্যের জোরে,
বাঁধা ছিল এক ডোরে,
ছিঁড়িল বন্ধন সব যাচ্ছে যমালয়।"

ফকিরচাঁদ রায় মহাশয়ের সময় বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ছিল না। ক্ষেত্রে অপরিমিত ধান্য, মুগ, মসুর, খেঁসারি, ছোলা, মটর ও সরিষা জন্মিত। গোয়াল গাভীতে ভরা; দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, ছানা বাড়ীতে হইত। পুষ্করিণী মৎস্যে পূর্ণ, বাগানে ফল তরকারী অপর্য্যাপ্ত, চাকরাণ দত্ত জোলাতে কাপড় যোগাইত, অতিথি অভ্যাগতে গৃহ চির মুখরিত ছিল। বাড়ীর পাঠশালায় বৃদ্ধ বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন ও বালক বালিকাগণ রীতিমত সেখানেই অধ্যয়ন করিত। সায়াহ্ন সময় 'হরি-সঙ্কীর্ত্তন, রামায়ণ, মহাভারতের কথা" ও কখন কখন আরব্য পারস্য উপন্যাস বলা হইত। সুস্থ সবল সুন্দর বালক এবং ততোধিক সুন্দরী বালিকায় রায়বংশ সমুজ্জল ছিল। সত্য সত্যই রায় বৃদ্ধের লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে বাগের পরিবার সব ছারখার হইয়া গেল।

"এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি,
কেহ না রহিল হায়! বংশে দিতে বাতি।"

অন্নপূর্ণারূপিণী বালিকা বধূ আমার মাতৃদেবীর শুভ আগমনে আমাদিগের বড় তরফের যেন শ্রী ফিরিয়া গেল ও সহসা কমলার কৃপা দৃষ্টিপাতে চারিদিকে সাংসারিক উন্নতির লক্ষণ দেখা দিল। তাহাতে পরিজনের বিশেষতঃ পিসিমাতা-গণের নব বধূর প্রতি সুদৃষ্টি পড়িল ও তাঁহারই "পয়ে" এইরূপ হইল মনে করিয়া তাঁহাকে সকলেই কন্যাবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। সেই নবমবর্ষীয়া ক্ষুদ্র বালিকা শৈশবের খেলা-ধূলা ভুলিয়া পর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জননীরূপে চৌধুরী গৃহ সমুজ্জল করিলেন। কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে সেই বালিকা এক্ষণে অতি বৃদ্ধা, ধন-সম্পদ, পুত্র-পৌত্রে পরিবেষ্টিতা; তথাপি পর দুঃখ শ্রবণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আত্মপর নির্ব্বিচারে সকলকে স্নেহ দান করেন। মাতৃঠাকুরাণী শ্রীমতী মগ্নময়ী দেবী অত্যন্ত দেশভক্ত। তাঁহার স্বদেশানুরাগ অতুলনীয়, ভারত-বর্ষের বালুকণা তাঁহার চক্ষে স্বর্ণরেণু। প্রত্যহ প্রাতে শয্যা ত্যাগের পর পূজা সমাপ্ত করিয়া সকলের জন্য "আশীর্ব্বাদী পুষ্প নামাইয়া" তবে জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি লোক দেখাইবার জন্য যাগযজ্ঞ ব্রতাচার কখন করেন নাই।

তাঁহার পার্থিব দেবতা স্বামী; সেই স্বামী-আজ্ঞা চিরকাল শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের সমুদায় এক আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন ও চরিত্রের অনুকরণে স্বীয় সন্তানগণকেও শিক্ষা দিয়াছেন। পিতৃ মাতৃ আদর্শের চরিত্রগুণে যাহার সন্তানগণ শিক্ষা পায় তাহারাই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করে।

কলেজ ত্যাগের পর পিতৃদেব পাটের ব্যবসা করিতে উদ্যোগী হইলেন। সঞ্চয় কিছু নাই অথচ ব্যবসা বাণিজ্য যাদুমন্ত্রে কখনও হয় না; ইহা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার কাজেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া ভ্রাতৃ-বৎসল পিসিমাতা ৺মৃণ্ময়ী দেবী স্বইচ্ছায় সেই বেনামী সম্পত্তির "দলিল দস্তাবিত" সব ফেরত দিতে ব্যগ্র হইয়া ভ্রাতাকে আদালতের আশ্রয় লইতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া আইন ব্যবসায়ীদের নিকটে গোপনে যাওয়া আসা ও পরামর্শ সংগ্রহ করিয়া কাগজ পত্র লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সকল বিষয়ে পিতাঠাকুর সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে রহিয়া কাণ্ডখানা কি দেখিতেছিলেন। এটি অনুচিত মনে করিয়া অতি ধীর ও গভীরভাবে একদিন পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীকে নিভৃতে ডাকিয়া কাগজ পত্র ফিরাইয়া দিতে যাওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট মুখে বলিলেন, "আপনার স্বামী বিশ্বাস ও স্নেহ বশতঃ ঐ সব আপনাকে রাখিতে দিয়াছেন। আপনি তাঁহা অজ্ঞাতে আমাদিগকে সেই সকল ফিরাইয়া দিয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ নিন্দনীয় হইবেন। স্বামী স্ত্রীলোকের সর্ববস্ব, ইহলোক পরলোকের একমাত্র সার, গতি মুক্তি। ভ্রাতা ত ভ্রাতা, আপনার ইষ্টমন্ত্র-দাতা গুরুদেব স্বয়ং আসিয়া চাহিলেও দিবেন না। আপনার এ ব্যবহারে আমি বড় মর্ম্মাহত হইয়াছি।" পুত্রাধিক স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠের এই নিঃস্বার্থ বাক্য শুনিয়া তিনি লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কথাটা যতই গোপনীয় হউক না, লোক পরম্পরায় অচিরাৎ তাহা পিসে মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাহাতে কোন চাঞ্চল্য না দেখাইয়া নিঃসন্তান প্রযুক্ত নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। চিরন্তন প্রথানুসারে পোষ্য যেরূপ হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। অলস বিলাসী ভোগসুখরত ও মোসাহেব দলে বেষ্টিত মূর্খ পোষ্যপুত্র পিসিমাতার অবাধ্য হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বিশেষতঃ আমাদের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত থাকায় আরো অনর্থ ঘটাইবার চেষ্টায় নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিসিমাতা মনদুঃখে কেবলই বলিতেন—

"ঘি দিয়া ভাজ নিমের পাত,
নিম না ছাড়ে আপন জাত।"

পোষ্যপুত্র নীলকণ্ঠের বিষের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠে রহিয়া গেল। তাহাকে লইবার পরই একত্রিশের অধিক বয়সে পিসিমার একটি মৃত পুত্র জন্মিয়াছিল এবং তাহার জন্মের পূর্ব্বে পিসে মহাশয় ভাবী সুখের আশায় পিসিমাতার নামে ত্রিশ চল্লিশ

হাজার টাকা আয়ের জমিদারী "স্ত্রীধন" দান বিক্রয়ের ক্ষমতা সহ লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পোষ্যপুত্রের কি আর কাহারো কোন অধিকার রহিল না, পিসিমাতাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া নিজের "স্ত্রীধনের" ভোগ দখল ও কর্ত্তৃত্ব করিতে "স্বত্ববতী" রহিয়া গেলেন।

কাল পূর্ণ না হইতেই কত জন অকালে চলিয়া যায়, আর সময়ে ডাক আসিলে ত সকলেরই যাইতে হয়। একে পিসে মহাশয়ের পারের কড়ি ঢের, তাহাতে বৈতরণীর তপ্ত বালুকার উপর পা পড়িয়াছে আর গৃহে ফিরিবার উপায় নাই, যাইতে হইবেই এবং তিনিও তাহা মনে মনে বুঝিয়া গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজসাহীতে খুব তোলপাড় পড়িয়া গেল। মৃত্যুকাল সন্নিকট, কিন্তু জ্ঞান টনটনে, ভুল-ভ্রান্তি কিছু মাত্র নাই, "বিনা যুদ্ধে এক সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিবেন না" শেষ পর্য্যন্ত সেই একই প্রতিজ্ঞা। তবু পিতৃদেব যে দলিল-পত্র হাতে পাইয়াও লন নাই, সে কথাটা শেষকালে তাঁহার মনকে দ্রবীভূত করিয়াছিল। তিনি সহরের প্রধান প্রধান লোকজন ডাকাইয়া আমাদিগের বহুপুরুষানুগত সেই বেনামীর অর্দ্ধেক সম্পত্তি ফেরত দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পিতৃদেবের নামে লেখা পড়ার আদেশ দিলেন। নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-পরায়ণ পিতৃদেব তাহাতে অসম্মতি জানাইয়া দৃঢ়ভাবে সর্ব্বসম্মুখে বলিলেন, "আমি একা বিষয় গ্রহণ করিব না, আমার দাদা, আমার পিতৃব্যপুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া আমি সম্পত্তি ভোগ করিব? ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না, দিতে হয়ত চারি জনকে সমান অংশে লিখিয়া দিন, নতুবা আমি চাই না। সামান্ত ধনসম্পত্তির জন্ত ধর্ম্মপথ ছাড়িতে পারিব না। আমাদের পৈতৃক বিষয় আইন-সঙ্গত আমাদের প্রাপ্য। আপনি বহুকাল ভোগ করিয়াছেন, এক্ষণে সময়কাল উপস্থিত, সব ছাড়িয়া দিয়া শান্তিলাভ করুন।" উদার-হৃদয় জ্যাঠামহাশয় সমবেত সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমার অংশ ছোট ভাইকে দিলেই আমি খুসি, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে কাকার ছেলেদের প্রাপ্যটা দিতে হইবে।"

এই প্রকারে লেখা পড়ার একটা গোল পড়িয়া গেল। বাবা জ্যাঠামহাশয়কে সকলে একবাক্যে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে কঠিনহৃদয় বৈষয়িক ব্যক্তিরও মন হয়ত কতক দ্রবীভূত হইয়া থাকে, কিম্বা ন্তায়সঙ্গত প্রাপ্য বলিয়াই হউক, কতকটা বিষয় চারি অংশে সমান ভাগে লেখাপড়া হইয়া গেল এবং পিতাঠাকুরের ধর্ম্মপরায়ণতার জন্ত পিসেমহাশয় মৃত্যুকালে স্বয়ং উপযাচক হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে একটা ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাঁহাকে পৃথক লিখিয়া দিলেন। সেটা তাঁহার সততার পুরস্কার। পিতৃদেব তাহারও অর্দ্ধেক আবার জ্যাঠামহাশয়কে দিয়াছেন! তাঁহাদের স্নেহ-নিদর্শনস্বরূপ তাহা এক্ষণে আমার।

গঙ্গাবর্জ্জিত দেশ বলিয়া আমাদের আত্মীয় কুটুম্বগণ সেকালে গঙ্গা লাভার্থ

মুরশিদাবাদ যাইতেন। এখনকার ন্যায় নৈহাটী কি কলিকাতা গমনাগমনের এমন সহজসাধ্য পথ তখন ছিল না। মৃত্যুর জন্য যাত্রা যতই কেন সমারোহে হউক না তাহার ভিতর যে গভীর শোকচ্ছায়া লুকাইত থাকে তাহাতে কেবলই করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অনেক লোকজন বন্ধু-বান্ধব সহকারে নৌকাযোগে পিসেমহাশয় জাহ্নবী-যাত্রা করিয়া শেষে মুরশিদাবাদে ভাগীরথী-গর্ভে অন্তিমে শান্তিলাভ করিলেন। হিন্দু রমণীর বৈধব্য জীবনের বিষয় বলিবার কিছু নাই; তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ আমাদের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরের পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা হইতে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার সেই একই নিয়ম। পিসিমাতা পতি বিয়োগে শোককাতরহৃদয়ে সেই জনাকীর্ণ গৃহে শূন্যভাবে প্রত্যাগত হইয়া হাহাকার রবে শয্যাশায়িনী হইয়া রহিলেন।

"নাট্যশালা সম সে সুন্দরী পুরীর" আলোক সব নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অতিথি অভ্যাগতের সমাদর রহিল না। পোষ্যপুত্র সহচর লইয়া সেখানেই বিরাজিত থাকিয়া দুর্ব্ব্যবহারে পিসিমাতার স্বাস্থ্য এবং শান্তি আরো ভঙ্গ করিয়া দিল। তিনি সেই যে শয্যা আশ্রয় করিলেন তাহা হইতে আর আরোগ্য হইয়া উঠিলেন না। পিতৃদেবকে স্বীয় সন্তানাধিক ভাল বাসিতেন। তিনি তৎকালে তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতেও পারিলেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের সব লোকসান হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিল। মাতৃসমা পিসিমাতা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর পিতৃ পরিবারের কি শোচনীয় সাংসারিক অবস্থা ঘটিবে ও তাহার প্রতীকার করা তাঁহাদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত। রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া তিনি কেবল ভ্রাতার পরিণাম চিন্তায় অধিকতর কাতর হইয়া পরলোকের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার স্বামীদত্ত সেই অমঙ্গলজনক স্ত্রীধন ভ্রাতার ভবিষ্যতের উপকারার্থে আইনজ্ঞ লোক দ্বারা সমস্ত রীতিমতন লিখিয়া দিলেন। তাঁহার সেই কল্যাণ কামনার দানপত্র শনিগ্রহরূপে আমার পিতৃ-গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবী সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিল।

সিপাহী বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় যখন সমগ্র দেশ ভস্মীভূত হইবার উপক্রম, চারিদিক বিপদাচ্ছন্ন, সেই সময় আমাদিগের পরিবারের সকলে পিসি-মাতাকে লইয়া মুরশিদাবাদে রওনা হইয়া গেলেন। ভরা ভাদ্রমাস, জলপথেও বিদ্রোহী সিপাইগণের অমানুষিক অত্যাচার, কোনরূপে জীবন লইয়া তাঁহারা যথাস্থানে পৌছিয়া নবাবসরকারে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্রোহী সিপাইগণ তাঁহাদিগের নৌকা লুঠ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ছিল। পিতৃদেবকে তাহারই পূর্ব্বে নবাব-বাড়ী হইতে "রায় রাঁইয়া" পদে নিযুক্ত করিতে এক আহ্বান-পত্র আসিয়াছিল। যদিও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই তবু সময়োচিত সাহায্য দানে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইলেন না এবং বংশানুগত

পরিচয়ের সম্মানটা রক্ষা করা হইল। এক সময়ে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ৺নয়নকৃষ্ণ চৌধুরী নবাব সরকারে উচ্চ পদারূঢ় ছিলেন।

মুরশিদাবাদের গঙ্গাতীরে গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় সেকালে বাস করিতেন। তিনি বিদ্যা বুদ্ধি এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। যিনিই গঙ্গাযাত্রা করিয়া যাইতেন তিনিই একবার তাঁহার নিকট শেষ দিনটা জানিয়া লইতেন। অর্থলালসা তাঁহার ছিল না, উচিত প্রাপ্য মাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি অনেক অন্তিম রোগীকেও বাঁচাইতেন, আবার সামান্য পীড়ার চিকিৎসার ভার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতেন। এমন নাড়ীজ্ঞান ছিল যে, মৃত্যুর ঠিক সময়, দিন, বলিয়া গঙ্গাতীরস্থ করিয়া দিতেন। আমার পিসিমাতাকে এক মাস "মেয়াদ" দিয়া নিত্যই অমনি অমনি দেখিতে আসিতেন। রোগীর অসামান্য গুণ, সুশিক্ষা, মার্জ্জিত বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সদালাপে বৃদ্ধ কবিরাজ পিতৃবৎ যত্ন সহকারে পুরাতন শাস্ত্র-তত্ত্ব-কথা তাঁহাকে শুনাইতেন, ইহলোক ও পরলোকের উচ্চতর বিষয় সকল বলিয়া তাঁহার মনকে একেবারে নির্লিপ্ত করিয়া তুলিতেন। কবিরাজ এদিকে আবার বড় কৌতুকপ্রিয় ও কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন। এক সময়ে কোনো এক বিধবা জমিদারনী অনেক অর্থলোভ দেখাইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থে গিয়াছিলেন। ঔষধ ইত্যাদি দিয়া তিনি যখন পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন তখন সমস্ত লোকের মুখ লজ্জায় অবনত হইয়া গেল। ভিষকপ্রবর উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছি কোনো ভুল হয় নাই, এ রোগীর এই ঔষধ-পথ্য, বেশী টাকার লোভ দেখাইয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা আমার কাছে দেবতাও কখন পাননা জানিবেন।" প্রাপ্য টাকা মাত্র গ্রহণ করিয়া পারিতোষিক অবজ্ঞাসহ ফেরত দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির প্রতি অতিশয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইতেন ও তাঁহাকে যে অর্থ-লোভ দেখান হয় সেটি অপমান-সূচক ব্যবহার মনে করিয়া তাহার প্রতিশোধ ঐ প্রকার স্পষ্ট কথায় লইয়াছিলেন। যে কালের কথা বলিতেছি, সে সময় মুরশিদাবাদে আরো একজন খুব দক্ষ, উদারচরিত্র ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার—যাদবচন্দ্র ধর ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ও-অঞ্চলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। চিকিৎসার সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুবিধ অন্য সব গুণে তিনি লোকরঞ্জক হওয়ায় বিদেশী রোগী সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেন। আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইয়া যাওয়াতে প্রত্যহ তাঁহারা যাওয়া আসা করিতেন এবং নানা রূপ কথা-বার্ত্তা ও জাতীয় উন্নতিকর কার্য্যের আলোচনা হইত ; স্ত্রী-শিক্ষা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। ডাক্তার ধর নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা দিবার নূতন নূতন উপায় ভাবিয়া স্থির করিতেন এবং গৃহে-গৃহে চিকিৎসার্থে যাইয়া তাহা প্রচার করিতেন। তাঁহার মত কেহ মনোযোগ সহ শুনিতেন, কেহ বা উন্মাদের প্রলাপবাক্যবৎ মনে করিয়া

হাসিতেন। পিতৃদেব ও আমাদিগের পরিজনগণের গঙ্গাবাসে থাকাকালীন, ধর মহাশয়ের হঠাৎ পত্নী বিয়োগ হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুজনিত শোকে কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে শয্যা আশ্রয় করেন। তাঁহার কাকা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন, "যাদব, তোমার এ কি শোক? স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতা বই ত না। এক জোড়া গিয়াছে আর এক জোড়া তার চেয়েও ভাল আনিয়ে দিব। কান্নাকাটি কি? ভাগ্যবানের বউ মরে, তামা পিতলে ঘর ভরে।" পিতৃব্যের এই সান্ত্বনাবাক্যে যাদববাবুর শোকের কোন প্রতীকার ত হইল না বরং স্ত্রীর উপর ঐ প্রকার অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানে আরো মর্ম্মাহত হইয়া ক্রমে সংযতচিত্তে কর্ত্তব্য পালনই করিতে লাগিলেন। সেই যৌবনে পত্নীর মৃত্যুর পরে প্রৌঢ় কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আর বিবাহ করেন নাই; জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিপত্নীক ছিলেন। "চটি জুতা" যে ছিঁড়িয়া গেল তাহা পুনর্ব্বার কিনিয়া গৃহে আনিতে পিতা মাতা কি কাকা কেহই পারিলেন না। সে কালের লোকের এক একজনের এমনই মানসিক তেজ ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল যে, তাঁহাদের চরিত্র-বলের কথা আজও কাহিনীর ন্যায় সকলে শুনিয়া থাকেন। এই কবিরাজ ও এই ডাক্তার সর্ব্বাংশে অতুলনীয় চরিত্রবান্, সদাশয় মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিষয় আমরা শুনিয়াছি, আবার আমাদের পরবর্ত্তিগণও শুনিতেছেন।

কবিরাজ-দত্ত কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পিসিমাতার দিন ফুরাইয়া গেল; তিনি অকালে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার চল্লিশ পূর্ণ হইবার আগেই গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, তাহাতে আমার পিতৃ-পরিবারের প্রত্যেকের মাতৃবিয়োগ তুল্য শোক, অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহার উপর নানাপ্রকার বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট পিতৃদেবকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলিল। শিশুকালে পিতৃহীন, বাল্যে মাতৃহারা ও যৌবনে একান্ত স্নেহময়ী মাতৃসমা ভগিনীর অসময়ে মৃত্যুতে পিতৃদেব সংসারে পুনর্ব্বার একেবারেই অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইলেন।

ভগিনীর মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃদেব দুইজনই বিদেশে এবং পিসি-মাতার তিনজন বধূগণসহ হরিপুরে রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের অজ্ঞাতে পুরাতন কর্ম্মচারিগণ পিতৃষসাদত্ত জমিদারী দখলের আয়োজনে দলে দলে পূর্ব্ববঙ্গীয় লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়া গোপনে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহাদের মন্ত্রগুপ্তি ভেদ করিতে পারা গেল না। জমিদারী দখলের দিন স্থির হইল অথচ প্রভুদের নিকট সমস্তই অজ্ঞাত রহিল। আমাদের অতি প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনায় সব লাঠিয়ালের আড্ডা। প্রভাত হইতে না হইতে তাহারা মালশ্রী (মালশী) শ্যামাবিষয়ক গান ধরিয়া লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র সান দিতে বসিয়া যাইত। মাথায় সকলেরই লম্বা বাবরি চুল, গায়ে মেরজাই, কাল ফিঁতা পাড় ধুতি পরিধানে, কোমরে গোট বিছা, দুই হস্তে তাগা, ও আঙ্গুলে স্বর্ণ অঙ্গুরীয়

এবং চক্ষে সুরমা। অধরোষ্ঠ তাম্বুলরাগ রঞ্জিত, চেহারা সব সুন্দর, দিব্য পাতলা, শরীরের কোন খানে মাংসাধিক্য নহে, হাস্যে মুখভরা, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দেখিলে আনন্দে অধীর হইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়, কণ্ঠস্বর মমতায় পরিপূর্ণ,বাহিরে দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই যে ভস্মাচ্ছাদিত বৈশ্বানর। সেই সব লোকই যে রাত্রে "গ্রামপল্লী লুটে লুটে ছারখার" করিয়া প্রয়োজন হইলে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা বড় কঠিন।

শ্রাবণের ঘোর বর্ষার অমাবস্যার রাত্রি চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আবৃত, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, বাহিরে যাওয়া অসাধ্য, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে লাঠিয়ালগণ দাঙ্গার যোগাড় যন্ত্রে ব্যাপৃত। সমস্ত লোকজন ব্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক কথা পাওয়া শক্ত। ভাব গতিক দেখিয়া পিসিমাতারা বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, দেখিতে না দেখিতে এক প্রহর রাত্রির মধ্যে সেই শত শত বলবান্ লাঠিয়াল ও পুরাতন দু'চারিজন কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যগণ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অন্তঃপুরে কোন সংবাদ পৌঁছিল না। পরিজনগণ সেই নিশীথ আঁধারে একান্ত দুর্ভাবনায় বসিয়া কাটাইলেন। রজনী প্রভাতে নিশাচরগণও ফিরিয়া আসিল। যত লোক গিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেকও প্রত্যাবর্ত্তন করিল না, আর যাহারা ফিরিল, তাহারা বাকী বেতনের জন্য তাগিদ দিয়া সকলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। বেতন শোধের সঙ্গে সঙ্গে তৈজস পত্র সহকারে কে কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহার তত্ত্ব পাওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রকার চিহ্নমাত্র রহিল না। কোথায় বাড়ী, কোন্ গ্রামে বাস, কি নাম কেহ কিছু জানিত না। পিতৃদত্ত নাম সব গোপন, লাঠিয়ালের দলের নামও অস্পষ্ট, পরিচয় কেহ জ্ঞাত নহে। লাঠিয়ালেরা চিরকালই গৃহহীন, যখন যাহার অধীনে কাজ করে, তাহারই গৃহে থাকে এবং বিপদ সংঘটন হইলে কে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, সন্ধান করিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে।

সেই নৈশ অভিযানের তৃতীয় দিবসে সহসা দারোগা বক্সী জমাদার ও সারি সারি চৌকীদার আসিয়া আমাদের কাছারী বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল ও তৎক্ষণাৎ সকল রহস্য চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। সেই ভয়ানক রাত্রে সকল লাঠিয়ালসহ আমাদের কর্ম্মচারীগণ অপর পক্ষের "জালেশ্বরের" কাছারী আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুঠপাট করে এবং অন্য পক্ষীয় লোকজন আত্মরক্ষার্থে বাধা দেওয়াতে মহা দাঙ্গা বাধিয়া যায় ও তাহাতে বহুসংখ্যক লোক খুন জখম হয়। কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহার কোনই হিসাব পাওয়া যায় না। এই জনরব মাত্র লোক প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে যে, বড়াল নদীর সাদা জল নরশোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় দুঃখাবহ ঘটনা এই, আমাদের লাঠিয়ালের সুদক্ষ সর্দ্দার "লাল খাঁ" প্রতিপক্ষের সহিত লাঠি খেলিতে খেলিতে হঠাৎ একটা বৃহৎ গাছ বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছিল ও অন্য দলের

একজন ভদ্রলোক প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া খড়্গাঘাতে তাহাকে কাটিয়া তাহার দেহ এক স্থানে ও শির অন্যত্র মৃত্তিকাতলে পুঁতিয়া দিয়া পলায়ন করে। একজনের কিম্বা এক দলের সঙ্গে লাঠি যুদ্ধের সময় অপরের তাহাতে ঐরূপ ভাবে আক্রমণ করা বা যোগ দেওয়া নিয়ম নহে। লাঠি খেলিবার সময় কখন বা লাঠিয়ালগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়, আবার পশ্চাদ্‌পদ হয়, সে কৌশল ও নিয়ম যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা লাঠি খেলার সুকৌশল ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক জমীদার গৃহের ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত সুদক্ষ লাঠিয়াল ছিল এবং সড়্‌কী চালাইতে জানিত। নতুবা দস্যুহস্ত হইতে ভদ্রলোকের কন্যা, বধূর যাতায়াতের পথে সম্মান ও জীবন রক্ষার উপায় ছিল না। প্রাচীন ধনবানের পুত্রেরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলা ও সড়্‌কী বন্দুক চালান শিখিতেন। অদ্যকার বৈচিত্র্যহীন নিরাপদ জীবন ও নিরুদ্বেগে গৃহবাস সেকালে ছিল না। দাঙ্গা হাঙ্গাম লুটপাট, সর্ব্বদা দস্যুভয় লাগিয়াই থাকিত।

"লাল খাঁর" এই ভয়ঙ্কর অকাল মৃত্যু শোকে তাহার জ্যেষ্ঠ "কালু খাঁ" আত্মহারা হইয়া সহসা শোকাকুলচিত্তে থানায় যাইয়া এত্তালা দিয়া "সুরত হালের" জন্য একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গোপনীয় কথা সকল প্রকাশ করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। লাল খাঁ একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে সে সময় চতুর্দ্দিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া বিপদের সীমা পরিসীমা রহিল না। লাল খাঁর মৃতদেহ তুলিয়া তাহার দাদা কর্ত্তৃক সনাক্ত হইলে সমস্ত আসামী পাবনায় চালান হইয়া যাইতে লাগিল। পথে ঘাটে দুই পক্ষের কোন নির্দ্দোষী লোকও বাহির হইতে পারিত না, যাহাকে পাইত তাহাকেই ধরিয়া ফেলিত।" "কালু খাঁ" সরকারী সাক্ষী স্বরূপ পুলিশের সঙ্গে রহিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। কোন লাঠিয়াল পূর্ব্বে এ প্রকার দলের নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করে নাই। "কালু খাঁ" কনিষ্ঠের শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া এইরূপ করিয়াছিল। পিতৃদেব ও জ্যাঠামহাশয় এ বিষয় অনভিজ্ঞ ও নির্দ্দোষ হইয়াও আসামী মধ্যে পরিগণিত হইলেন এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবাসে রহিয়া গেলেন।

এমন ভয়াবহ দাঙ্গা ও মারামারি কাটাকাটি রাজসাহী জেলায় কখনও হয় নাই ও ভবিষ্যতে হইবে না। এ একটা ছোট-খাট রাম রাবণের যুদ্ধ বিশেষ। কত লোকের দ্বীপান্তর, বার চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড হইয়া গেল এবং অধিকাংশ লোক প্রাণভয়ে গৃহবাস ছাড়িয়া ফকিরী গ্রহণ করিল। আর আমাদিগেরও প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। সিপাই বিদ্রোহ পরে যেমন "নানাসাহেবকে" ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিয়া "হয়রাণ" হইয়াছিলেন, এ সময়েও তেমনি হইল। কত সন্ন্যাসী বৈরাগী ধৃত হইয়া আসিয়া বিচারে নিস্কৃতি লাভ করিল তবুও লাল খাঁর যথার্থ হত্যাকারী "তালুকদার মহাশয়কে"

কেহ ধরিতে পারিল না। দলে দলে পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ম্মচ্যুত, ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানান্তরিত ও চৌকীদারগণ দণ্ডিত হইয়া কে কোথায় চলিয়া গেল। পুরস্কার বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত করিয়া হাটে বাজারে গ্রামে গ্রামে দেওয়া হইল, দামামা কাড়া পিটাইয়া পাড়ায় পাড়ায় অর্থ প্রলোভন দেখান হইল, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে হত্যাকারীকে কেহই ধরিয়া দিল না। সর্ব্ব চেষ্টা অর্থব্যয় বৃথা হইল মাত্র। "জালেশ্বরের" সে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত আমরা আশৈশব যেমন শুনিয়াছি এক্ষণে আবার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্রীগণও তেমনি শুনিতেছে। পুরাতন ভৃত্যবর্গ আত্মীয়স্বজন ও যাহারা দ্বীপান্তর হইতে দ্বাদশ চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে প্রত্যাগত, তাহারা এ কথা কদাপি বিস্মৃত হইতে পারেন না। সেই কাল রাত্রির দুর্ঘটনা আমাদিগের পরিবারগণের মধ্যে চিরস্মরণীয়। সে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অধ্যায় যতই দুঃখজনক হউক না রাজদ্বারে কাহারো যে প্রাণদণ্ড হয় নাই ইহাতেই আমরা সুখী। পিতৃদেবের স্কন্ধে অনেক দুর্ব্বিসহ ঋণ চাপিয়াছিল। তিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া অনাহার অনিদ্রায় তাহা পরিশোধ করিয়া ঋণমুক্ত হন। আমার তিন বিধবা পিতৃস্বসা এই মোকদ্দমার সমুদায় তত্ত্বাবধান এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে তাহাতে অধিকাংশ নির্দ্দোষ ব্যক্তি নিরাপদে কারামুক্ত হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের বিচারে তাঁহাদিগের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির বহুতর প্রশংসা হইয়া তাঁহাদিগের নাম সাক্ষীশ্রেণী হইতে উঠিয়া যায় এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন।

আমাদিগের পারিবারিক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পরেই আবার নাটোর রাজবাড়ীর পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। পিতৃদেবকে তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য মহারাণী কৃষ্ণমণি অনুরোধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। মাতৃস্বসার স্নেহানুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। পোষ্যপুত্র, কুমার বাহাদুর গোবিন্দনাথ অতি বালক, তিনি অসিদ্ধ প্রমাণ হইলে বড় তরফ ভাসিয়া যায়। যাহাতে রাজবাটী বজায় থাকে এবং পোষ্যপুত্র সিদ্ধ হয় তাহার জন্য পিতৃদেব অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কলিকাতায় নির্ব্বাসিত প্রায় থাকিয়া রাজবাড়ী রক্ষা ও পোষ্যপুত্র সিদ্ধ করিয়া সকল কষ্ট সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। সে সকল রাজকাহিনী পুনর্ব্বার তুলিতে যাইলে আর এক নূতন উপন্যাস আরম্ভ করিতে হয়; কাজেই তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমিই পিতামাতার প্রথম সন্তান, জন্ম মাতামহালয় পাবনা জেলার বাগে। দুর্গাপূজার পূর্ব্ব পঞ্চমীর দিন চারিদিকে নহবৎ, পূজার বাদ্য ও মহামায়ার আগমনের আনন্দ, গৃহের বালক বালিকা নববস্ত্রে সুসজ্জিত এবং আত্মীয় কুটুম্বে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ, এমন সুদিনে আমার পৃথিবীতে আগমন। ভাগ্যবতী সুলক্ষণা কন্যা গণনায় ঠিক হয় তাহার প্রমাণ কিন্তু জীবনে কখন পাওয়া যায় নাই। সে কালের প্রথানুসারে আঙ্গিনায় কুঁড়েঘরে আমি

জন্মিয়াছিলাম, এবং দলে দলে প্রতিমা দর্শনপ্রার্থীগণ আমাকে একবার না দেখিয়া যাইতেন না। বৃদ্ধেরা নাকি দেখিয়াই বলিতেন "কুঁড়ের দুয়ারে দেখি রাকাচন্দ্রমুখী।" বাগ হইতে হরিপুর তিন দিবসের জল পথ। তখন তারের খবর ছিল না, লোক দ্বারা শুভ অশুভ উভয়বিধ সংবাদই পাঠান হইত, আমারও জন্ম সমাচার ভৃত্য প্রমুখাৎ প্রেরিত হইল। বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের ঘাটে ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্ম সংবাদ পাইয়া সে দিনের সমস্ত নূতন পরিচ্ছদ, স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ও আরো কিছু নগদ অর্থ জ্যেষ্ঠতাত মুক্তহস্তে ভৃত্যকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন ও আনন্দে পরিজনদিগকে স্বয়ং যাইয়া সংবাদ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। আজকালের দিনে এক পয়সার কার্ড বা ছয় আনার তারের খবরে পুত্র কন্যার জন্ম সমাচার পাঠান হয়। পারিতোষিকে কাহারো কোন অর্থ ব্যয় হয় না। সেকালে সে প্রথা ছিল না, প্রাচীন দাসদাসীগণ শুভ সংবাদ বহন করিতে যাইয়া শাল, দোশালা, বালুচরী চেলী, আশমানতারা, নয়নতারা সাড়ী প্রভৃতি এবং ঘটী থালা কলসী পুরস্কার পাইয়া এক বৎসরের আহারের সংস্থান লইয়া গৃহে ফিরিত। আমার জন্ম সংবাদ দানে ভৃত্য অনেক লাভ করে। প্রজারা পর্য্যন্ত চাঁদা তুলিয়া অর্থ একত্র করিয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিল। তৎকালে টাকার তেমন চলন ছিল না, কড়ি সর্ব্বকার্য্যে চলিত। এক কাহন কড়ি পাইলে লোকে কত কৃতার্থ জ্ঞান করিত। অত টাকা পাইয়া সে গরিব বেচারি চাকর যে আহ্লাদিত হইয়াছিল তাহা আমি এখনও কল্পনা করিয়া সুখী হই। সুখ দুঃখের স্মৃতিই আমাদিগকে জীবিত রাখে। স্মৃতি না থাকিলে আমরা কিরূপে বাঁচিতে পারি ? সুখের স্মৃতি যেমন সুখাবহ, দুঃখের স্মৃতিও তেমন দুঃখজনক, তথাপি অতীত কখন ভুলিতে চাহি না। একদিন যাহা অত্যন্ত সুখের ছিল আজ তাহা নাই বলিয়া কাঁদিব তবুও সেই পবিত্র স্মৃতি বিস্মৃত হইতে চাহিব না। জগতের নিয়মই এই।

আমাদিগের রাজসাহীর আচার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম সব এ অঞ্চলের সঙ্গে মিলে না। পুত্র কন্যার অন্নপ্রাশন কখন মাতুলালয়ে হইবার প্রথা নাই, আমারও তাহা হয় নাই। নয় মাস বয়সে শুভ দিনে পিত্রালয়ে আমার অন্নপ্রাশন হয়, নাম অনেক বাছিয়া বড়পিসিমাতা "প্রসন্নময়ী" দিয়াছিলেন। তখন গহনা পরা এখনকার মত ছিল না, সাজসজ্জাও অন্যরূপ। আমার হাতে রূপার বালা, গলায় স্বর্ণ কণ্ঠমালা, মাথায় সোণার চূড়া ও পায়ে নূপুর ছিল। ঘাঘরা কুর্ত্তা চাদর এবং নানাবর্ণের নাগরা জুতা পরিতাম। কপালের উপর থরকাটা ও কাণের পাশে জুলপি ছিল। বিবাহের পরে সে সব সাজের পরিবর্ত্তে অন্য অলঙ্কার পরিতে হইত। হাতে বেঁকি চুড়ী, নারিকেলফুল, পৈঁছে, গলায় চাঁপকলি, তুলসী-দানা, কাণে কদমফুল পিপুঁলপাতা, নাকে বেসর, কোমরে গোট ও পায়ে মল, গুজরী পঞ্চম। জুলপি তখন আর থাকিত না। কপালে সিঁথিপাটী থাকিলেও

সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত থরকাটা রাখা হইত। গৃহিণীদিগের হাতে বাউটী, ছোন, পাঁচদানা, কণ্ঠে কামরাঙ্গা হার, নাকে নথ, কাণে কড়ি কিম্বা ঢেঁড়িঝুমকা, কোমরে চন্দ্রহার, পায়ে ব্যাকমল, এই সকল পরিয়া সিমন্তে সিন্দুর কোঁটা দিয়া ও লাল চেলীর সাড়ী পরিধান পূর্ব্বক যখন তাঁহারা শারদীয়া পূজার সময় মহা-মায়ার পদে অঞ্জলি দিবার জন্য যুক্তকরে আসিয়া একত্র দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে প্রতিমার পাদপদ্ম পূজা করিতেন, সে সময় এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য কর্ত্তারাও অন্তঃপুরে আসিয়া অন্তরাল হইতে গৃহিণী সুন্দরী ও বধূগণকে দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেন।

আমরা শৈশবে অনেক সময়ই বালক বেশে কাছারী বাড়ীতে সরকারের নিকট পড়িতে যাইতাম। পিতৃদেব ছুতার মিস্ত্রী দ্বারা বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ খোদিত করিয়া অক্ষর পরিচয় করাইয়াছিলেন। পাঠশালায় যাইবার রীতি ছিল না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর স্কুলে গৃহের বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা কেবল-মাত্র প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়ান ও দেবার্চ্চনার আয়োজন সব নির্ভুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কার্য্যও শিক্ষা হইত। পাথরে ছাঁচ কাটা, শিকা তৈয়ারি, কাঁথা সিলাই, নারিকেলের চিড়ে, জিরে, পদ্মচিনি, ধানের মালা, কঙ্কণ, নানা প্রকার আলিপনা ও শুভকার্য্যে পিঁড়িচিত্র এবং পঞ্চরঙ্গের গালিচা, দুলিচা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকর ও সৌখীন শিল্প শিক্ষা দিতে পরিপক্ক গৃহিণীরাই গুরুগিরি করিতেন। যে বালিকা শ্বশুরালয়ে যাইয়া প্রথমে সুন্দররূপে শিব গড়াইতে পারিতেন না, তাহার পিতামাতার বড় লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। বধূমাতা "ম্লেচ্ছ কন্যা" নামে অভিহিত হইয়া হাস্যাস্পদা হইতেন। অপর দিকে এক এক সমারোহের বিবাহ সভায় শিল্পনিপুণা মহিলাগণ কর্ত্তৃক পঞ্চবর্ণের চিত্র বিচিত্র গালিচায় বরযাত্রী বসিতে যাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া চারিদিকে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিতেন, তখন গৃহিণীদিগের প্রশংসা ধ্বনিতে আসর মুখরিত হইয়া উঠিত।

"নীতিকথায়" কাদাখোঁচার গল্প পড়িয়া দেশে আমার যে বিদ্যা হয়, তাহা আবার সঙ্গিনীগণের সহিত খেলা ধূলায় কতক ভুলিয়াও যাই। পিসিমাতাদিগের নিকট প্রত্যহ "রামায়ণ, মহাভারতের অমৃতময় কথা" শুনিয়া শুনিয়া এত আয়ত্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহা আর শিখিবার জন্য নূতন করিয়া পড়িতে হয় নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইবার পরেই জ্যেষ্ঠতাতের কনিষ্ঠ পুত্র ৺কালী-প্রসন্ন দাদা গানের সুরে "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" ও ঐ দুই পুস্তক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। আমাদের ছোট বড় দুই তরফের সকলে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকা পর্য্যন্ত অতি মনোযোগ সহ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। গঙ্গার স্তব, "অঙ্গদের রায়বার" ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

প্রভৃতি মধুর কণ্ঠে এমন সুললিত তান লয় সংযোগে গাহিতেন যে শ্রোতাগণ একেবারে মুগ্ধ ভাবে কত রাত্রি বসিয়া শুনিতেন। প্রাচীন দাস দাসীরাও ভক্তি-ভরে কাঁদিয়া ফেলিত।

শৈশবে আমরা সব বালিকা একত্র মিলিয়া কার্ত্তিক মাসে "যমপুকুর" ও বৈশাখে "পুণ্যপুকুর" * পূজা ও "নিত্যসুন্দরী" "ফলদানের" ব্রত ইত্যাদি করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতাম। আমাদের সাহায্যার্থে দুই বাড়ীর বালকগণ একত্র হইয়া কত ফুল ফল আনিয়া দিত। যে বালিকা যাহার অধিক প্রিয় ও খেলার সঙ্গিনী, সে তাহাকে আবার বেশী মাত্রায় সকলি দিয়া পরিতুষ্ট করিত। তাহাতে কখন কখন কলহ হইয়া যাইত। পল্লীগ্রামের বালক বালিকা সর্ব্বদা এক সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকে। সবই আপনার লোক, দাদা, ভাই, কাকা, মামা, লজ্জা করিবার সম্পর্ক কাহারো সহিত নহে। তখন ব্যাটবল ফুটবল খেলা ছিল না, "হাডুডু, চোর চোর, ডাণ্ডাগুলি" সন্তরণ ও ঘুড়ি উড়ান প্রধান খেলা ছিল। অনেক বালিকা তাহাতে যোগ দিত। আমি আশৈশবই শারীরিক পরিশ্রমে কাতর ও শরীর তেমন সবল না থাকায় জন্য খেলাতেও প্রাধান্য লাভ করিতে পারি নাই।

সে কালের ঘুড়ি উড়ান এ কালের বালকগণের কল্পনার অতীত। পল্লীর বৃদ্ধরাও সে ঘুড়ি উড়াইবার সহচর থাকিতেন। "ঢাউস্" "কোয়াড়" "মানুষ" এই সব বৃহৎ বৃহৎ ঘুড়ি উচ্চে শূন্যে উড়াইবার সময় গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা একত্র হইয়া সে তামাসা দেখিতে আসিতেন। এক একখানা ঘুড়ি সপ্তাহ ধরিয়াও উড়িত, তাহার উড়িবার গর্জ্জন বহুদূর হইতে শুনা যাইত। যে দল সেই ঘুড়ি উড়াইয়া জয়লাভ করিত, তাহারা ঢাক বাজাইয়া "মঙ্গল চণ্ডীর" পূজা দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত। আমার ৺কালীপ্রসন্ন দাদা এই সকল খেলায় অগ্রগণ্য ও দলের অধিপতি ছিলেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া গ্রামে কোন খেলাই হইতে পারিত না। তিনি শীকার করিতে, "কোঁচ" দ্বারা মাছ মারিতে, ধনুক চালাইতে এবং লাঠি খেলিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সমস্ত হরিপুরের ভদ্রলোকের ও কৃষক-গণের বালকেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সতত ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তিনি যাহা আজ্ঞা করিতেন, তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে সম্পাদন করিত। আজ্ঞাবহ ভৃত্যবৎ তাঁহার

---

* পুণ্যপুকুর পূজার মন্ত্র।

"পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে ঠিক দুপুর বেলা?"
"আমি সতী লীলাবতী
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী,
শিব তুল্য স্বামী চাই,
কার্ত্তিক গণেশ কোলে পাই,
মরণ হয় জাহ্নবী জলে
এই বর মাগি চরণ তলে।"

বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া চলিত। তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজা বিশেষ ছিলেন, যদিও অতি দুরন্ত বালক, তবু দয়া মায়া স্নেহ মমতায় সর্ব্বজয়ী হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় মনোযোগ তেমন দিতেন না, অত্যন্ত মেধাশক্তি থাকায় যাহা পড়িতেন তাহাতেই ক্লাশে সকলের উপর হইতেন। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলিতেন "এমন বীর ও উদার হৃদয় বালক এ অঞ্চলে আর নাই।"

গ্রামে বালকদিগের আর এক উপদ্রব ছিল "নষ্টচন্দ্রের" দিন। সে রাত্রি বালকগণ গৃহস্থের ফলের বাগান এবং তরকারী সব লুঠ করিত, দলবদ্ধভাবে গ্রামান্তরেও চলিয়া যাইয়া "নষ্টচন্দ্র" দেখার দোষ খণ্ডাইয়া আসিত। তাহাদের সে দৌরাত্ম্য সকলে হাস্যমুখেই সহ্য করিতেন ও যে গ্রামেই নিশীথে যাইয়া উপস্থিত হইত, সেখানেই তাহাদের দস্যুতার চিহ্ন সর্ব্বত্র দিব্য বিদ্যমান থাকিত। সে জন্য কেহ কখন অভিভাবকের নিকট অনুযোগ করিতে আসিতেন না। শ্রাবণ মাসে বড়াল নদী যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, খাল, বিল, ঝিল, জল-প্রবাহে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই সময় আমাদের গ্রামের বারোয়ারী পূজা হইত। সে এক অপূর্ব্ব মহোৎসব। নদীবক্ষে অসংখ্য সজ্জিত তরণী, কত রাজা মহারাজা তাহাতে বাস করিয়া পূজা দেখিতেন। অতীব জন কোলাহল, বাজার বিপণি মনোহর দ্রব্যে শোভাময়। মাঠে ছোট ছোট ঘর ও তাম্বুতে গায়ক গায়িকার দল বাসা বাঁধিয়া উৎসবে যোগদান করিতে আসিত। দানের হিসাব ছিল না, আহারের আয়োজন রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় "দীয়তাং ভূজ্যতাং" মুক্তহস্তে অতিথি সেবা চলিত। বড়মানুষের নৌকায় যে সিধা দেওয়া হইত—তাহাতে দুচারিটা জাঁকের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইতে পারিত। "সিধুলী, আমহাটীর" দধি, নাটোরের তুঁতফল ও হরিপুরের অবাক্ সন্দেশের দ্বিগুণ মূল্য বাড়িয়া দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিত। পাঠশালা বন্ধ। ছেলে মেয়ের অন্য কোন কার্য্য থাকিত না, কেবল আহার। সুস্থকায় পল্লীর বালক বালিকা অতি ভোজনেও রোগে শয্যাগত হইত না। সেই একটা তখনকার সুখের বিষয় ছিল।

সেকালে "গোবিন্দ অধিকারী, মধুসূদন-কান্ ও লোকা ধোপা" অতি দক্ষ যাত্রা গায়ক ছিল। তাহাদের যাত্রা শুনিতে শুনিতে রজনী প্রভাত হইয়া যাইত, কর্ত্তারা আত্মহারা হইয়া চারি ছয় দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত গানই শুনিতেন, তাহার পর প্রাপ্য টাকার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রের শাল, দোশালা, শাড়ী, ধুতি, উত্তরীয় রাশীকৃত ভাবে চারিদিক হইতে বর্ষণ হইত। এক এক সময় বাবুরা গৃহিণীগণের নিকট হইতে সোণা রূপার গহনা মাঙ্গিয়া আনিয়া দিতেন। অন্তঃপুর বাসিনী মহিলারা তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিতেন না। পূজান্তে দু'চারিমাস কেবল মাঠে ঘাটে শুধু "গোবিন্দ অধিকারীর মা যশোদার কৃষ্ণ বিচ্ছেদের করুণ গীতি, লোকনাথের মশান ও মধুকানের (কিন্নর) মাথুর" রাখাল কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইত। এখন সেরূপ সুমধুর যাত্রা আর নাই। রঙ্গালয়ের ভাবভঙ্গী অনুকরণে এখন যে যাত্রা

গান হয়, সেটা ছোট খাট অভিনয়ের বিসদৃশ রূপান্তর মাত্র।

দিবসে পুরনারীগণ কালী প্রতিমা দেখিতে যাইতে পারিতেন না। বারোয়ারীর শেষ দিনে, সমস্ত অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে রমণীরা সব প্রতিমা দর্শনে যাইতেন। সঙ্গে দাস দাসী পাইক সর্দ্দার "বডিগার্ড" স্বরূপ থাকিত। অন্য পুরুষ সেখানে যাইতে পারিত না। গায়িকার রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ক ঢপের গান চলিত, আর বিপণি সব তেমনি থরে থরে সজ্জিত থাকিত। বধূমাতারা ও কন্যাগণ ইচ্ছামতন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া বড় সুখানুভব করিতেন। যদি একালের মতন ছবি উঠাইবার নিয়ম থাকিত তাহা হইলে এই বারোয়ারী পূজার সমারোহের প্রতিকৃতি তুলিয়া রাখিলে ভাবীবংশধরগণ এক্ষণে দেখিয়া সুখী হইত। যে দিন যায় তাহা ত আর ফিরিয়া আইসে না, স্মৃতিতে কেবল চিহ্নমাত্র রহিয়া যায় ও কালক্রমে তাহাও আবার ক্ষীণতর হইয়া লুপ্তপ্রায় হইতে থাকে।

"জালেশ্বরের" হাঙ্গামার চূড়ান্ত মীমাংসার কয়েক মাস পরে আবার শত্রুপক্ষ আমাদিগের বাড়ী হঠাৎ রজনী যোগে আসিয়া লুটপাট করিবে এই জনরব চতুর্দ্দিকে এক সময় রটিয়া যায় এবং পুরুষ অভিভাবক গৃহে না থাকায় জ্যেঠিমাতারা অতিশয় ভীতা হইয়া নাটোর রাজধানীতে মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবীর নিকট সংবাদ পাঠান। সেখান হইতে ডুলি পালকী বরকন্দাজ ও পুরাতন ভৃত্য প্রভৃতি আসিয়া রাত্রিকালে মাতৃঠাকুরাণী, জ্যেঠিমাতা ও অন্যান্য মহিলাগণকে জঙ্গল পথে লুক্কাইত ভাবে লইয়া যায়। মূল্যবান সামান্য অলঙ্কারের পেটিকা মাত্র সঙ্গে থাকে, দস্যুভয়ে নগদ টাকা সবই ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হন। আমি তখন অতি ক্ষুদ্র বালিকা। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া লোক জন সহ ডুলি যাইতেছিল। "মা বৌমানুষ", অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত, কাহারো সঙ্গে কথা বলিতে পারেন না, বিশেষতঃ রাজবাড়ীর সব লোক, তাহাদিগের সম্মুখে বাহির হওয়াই নিষেধ। জ্যেঠিমাতার ডুলি অগ্রেই চলিয়া গেল। বরকন্দাজের দল ও বাহকরা অধিকাংশ তাঁহার সঙ্গে। আমাকে লইয়া মা পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন। নিবিড় বনরাজি, অসমতল পথ, মনুষ্য সমাগম রহিত। মা ডুলির ঘেরাটোপ উঠাইয়া ভয়ে ভয়ে সব দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বরকন্দাজরা ডুলি অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছে ও অন্য ডুলি দূরে চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া বাহকগণকে তাড়া ও গালি দেওয়াতে তাহারা অতিবেগে চলিতে লাগিল ও ক্ষুদ্র আমি সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে মাতৃক্রোড় চ্যুত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। লজ্জাবশতঃ মা প্রথমতঃ কিছু বলিতে পারেন নাই, পরে যখন দেখিলেন সাহকেরা চলিয়া যায়, তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলে বরকন্দাজ সব ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য চারিদিকে খুঁজিতেই আমাকে জঙ্গলের মৃত্তিকায় পতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে "আরে রাম রাম" বলিয়া তুলিয়া আদরে আবার মাতৃকোলে দিয়া দিল। আমি

যে অমন অস্থানে পড়িয়াও কাঁদি নাই ও দিব্য তাকাইয়া সব দেখিতেছিলাম তাহাতে তাহাদিগের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইয়াছিল এবং আমার শরীরের কোনখানে সামান্য আঘাতও লাগে নাই সেজন্য "সীতারাম" স্মরণ করিতে করিতে ভুলির সঙ্গ আর ছাড়িল না। দোলা যথাকালে রাজবাড়ী পৌছিলে "মামণির" (মহারাণী কৃষ্ণমণি) নিকট খুব সুখ্যাতি ও কিছু উপহার লাভ হইয়াছিল।

নাটোরের বড় তরফের সহিত সম্পর্ক ও বিশেষ আত্মীয়তা থাকার জন্য ছোট তরফের সঙ্গে কুটুম্বিতা এবং বিবাহ উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণে যাতায়াত ছিল। ছোটরাজা আনন্দ নাথ রায় বাহাদুরের সাদর নিমন্ত্রণে তাঁহার পুত্র কন্যার বিবাহে আমরা সকলেই গিয়াছিলাম। বড় তরফে অবস্থিতি ও ছোট তরফে খিড়কীর পথে সর্ব্বদা যাওয়া আসা ও আহারাদি হইত। বিবাহের মহা-সমারোহ, গান বাজনা নাচ তামাসা ও আতসবাজী, অবিশ্রান্ত আনন্দ কোলা-হল, আমরা বালকবালিকা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহাই দেখিতাম, শুনিতাম। আমার জ্যাঠামহাশয় সর্ব্বে সর্ব্বা, স্পষ্টবাদী ও রাজ তোষামদের ধার দিয়াও কখন যাইতেন না। তাঁহার নিকট সব সমান; "কেবা রাজা, কেবা প্রজা, নাহি জানে রাজসেবা" প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে অপর সাধারণে খুব মানিয়া চলিত এবং রাজা মহারাজগণ তাঁহার সত্য কথা ও স্বাধীন ব্যবহার ভিতরে ভিতরে তেমন পছন্দ না করিলেও বাহিরে খাতির দেখাইতেন। তবে তাঁহাকে কোন বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় অপ্রতিভ করিতে পারিলে সুখানুভব করিতেন। অমন একটা জাঁকের বিবাহ, রাজসাহীর সমস্ত রাজন্যবর্গ ধনী গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। নাচ গানের মজলিসে লোকে লোকারণ্য, বালিকা প্রযুক্ত আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার হাতে রৌপ্যবালা দেখিয়া জ্যাঠা মহাশয়কে অপ্রস্তুত করিবার জন্য ছোট রাজা বাহাদুর আমার হাত ধরিয়া সকলের সম্মুখে বলিয়াছিলেন "তুমি বড় চৌধুরীর ভাইঝী, কেন রূপার বালা পরিয়াছ? সোণার বালা চাও?" ক্ষুদ্র আমি, তাঁহার দিকে উদাসীন ভাবে তাকাইয়া হাসিয়া নাকি বলিয়াছিলাম "বড় মানুষের মেয়েরা রূপাই পরে, পরের সোণা গায় দেয় না।" আমার ন্যায় ছোট বালিকার মুখে এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া আসরে একটা হাস্যের কোলাহল পড়িয়া গেল, গায়ক বাদক ও নর্ত্তকীরা পর্যন্ত এমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল যে, সে সভায় অনেকক্ষণ গান বাজনা নাচ থামিয়া গেল। জ্যেষ্ঠতাত আনন্দে উচ্ছ্-সিত হইয়া "এসো মা এসো" বলিয়া আমাকে একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, আর ছোট রাজা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। এই ঘটনার পরেই জ্যাঠামহাশয় আমার হাতে সোণার "কাটা বালা" (পুরাতন গহনা বিশেষ) গড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতে আমিও ছোট খাট একটী "হরিপুরের ঠাকুরঝির" মধ্যে গণ্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে বাড়ীর ছোট বড় মেয়েরা

সকলেই "ঠাকুরঝি মা বা ঠাকুরঝি মহাশয়া" নামে অভিহিত। গৃহে কর্ত্তা কিম্বা বাবুজী মহাশয়রা ব্রাহ্মণ প্রযুক্ত ঠাকুর, তাঁহাদের কন্যাগণ তাই ঠাকুরঝি। "দিদিবাবু" দিদিঠাকুরাণী ডাক ঐ অঞ্চলে এখনও নাই।

সিপাই বিপ্লবের সময় আমি যে ঠিক কত বড় তাহা জানি না। তবে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীগণ যৎকালে উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে দৌরাত্ম করিয়া বেড়াইতেছে, জনসাধারণ তাহাদের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারে না, সেই দুর্দ্দিনে আমরা নৌকাযোগে মাতামহালয় হইতে পিত্রালয় হরিপুর ফিরিবার পথে শুনিলাম সিপাইরা সব আরোহীর নৌকা আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু পাইতেছে তাহাই লুঠ করিতেছে। এই সংবাদে আমাদের নৌকার লোকজন অতীব ভীত হইয়া মার সঙ্গে আমাকেও নৌকার কুঠ্‌রী মধ্যে গোপনে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। বাল্য সুলভ কৌতূহল বশতঃ কেবলই তাহাদিগের সৈনিক বেশে নৌকায় আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শেষে নৈরাশ্য সহকারে নির্ব্বিঘ্নে গৃহ প্রত্যাগত হইয়া পরিবারদিগকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিলাম। এই বিপ্লববহ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পরই প্রতি থানায় পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কড়া পাহারার প্রথা প্রচলিত হয়। আমরা শৈশব হইতে জলপথে নৌকায় মাতামহালয়ে যাতায়াত করিতাম। দ্রুতগামী নৌকা যখন ছায়াময় গ্রামপল্লী পশ্চাৎ করিয়া চলিয়া যাইত, কত শ্যামল প্রান্তর, সৌষ্ঠবশালী জনপদ, সমুচ্চ বৃক্ষ শ্রেণী এবং নয়নানন্দ ঘন তৃণাবৃত গোচারণের মাঠ দেখিয়া নেত্র মন পরিতৃপ্ত করিতাম। মনে হইত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দর দৃশ্য যেন জীবন্ত আকারে জলের মধ্য দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। যেখানে যেখানে লোকালয়ের নিকট নৌকা ভিড়াইয়া হাট বাজার করিত, সেই সব স্থানে সরলা পল্লী বধূগণের কলসী কক্ষে ঘাটে আগমন ও তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় মুহূর্ত্তে পরিচিত হইয়া যাইতাম। ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহারা আবার আমাদের জন্য ফল তরকারী দুগ্ধ ইত্যাদি অযাচিতে বিনামূল্যে নৌকায় আনিয়া দিয়া যাইত। সে কত সুখের দিনের স্মৃতি, আজও ভাবিলে সুখানুভব হয়। আশৈশব প্রকৃতির মুক্ত শোভার মধ্যে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত বলিয়া জীবনের এত শোক দুঃখের ভিতর এবং বৈতরণীর তীরে বসিয়া আজিও স্বভাবের সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগে যাইতে হইলে পাল্কীতে যাইতে হইত। বাহক, দাস, দাসী, পাইক, সঙ্গে থাকিত। সকলদিন পথ চলার পরে রাত্রে কোন গৃহস্থ ভবনে আশ্রয় লইয়া আহারাদি করিবার নিয়ম ছিল। একবার আমরা না জানিয়া এক গোয়ালা ডাকাতের বাড়ী উঠিয়াছিলাম। তাহারা মাকে পরমাদরে গৃহে লইয়া বিবিধ খাদ্য আনিয়া দিল ও রাত্রে রন্ধনের যোগাড় করিয়া রন্ধন করিবার জন্য বিশেষরূপে ধরিয়া পড়িল, এমন সময় পরিচারিকারা কি প্রকারে জানিতে পারিল যে "ডাকাতের বাড়ী" এবং গৃহকর্ত্তা স্বয়ং ডাকাত। শুনিয়া ত ভয়ে মায়ের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভীত ও

নিরুপায়ভাবে রন্ধনে অসম্মত হইয়া জ্যোৎস্না উঠিলেই চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন। ডাকাতের দয়াবতী বিধবা ভগিনী তখন সকল বুঝিতে পারিয়া মাকে সাহস দিয়া বলিতে লাগিল "ভয় কি মা, আমি থাকিতে তোমার পায়ে কাঁটাও ফুটিবে না, তোমরা নিরাপদ। রন্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া পাতের প্রসাদ দিয়া যাও, আমার দাদার মুক্তি হইবে।" মা তাহার সহৃদয় ব্যগ্র অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং সেও চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে মাকে নির্ব্বিঘ্নে গ্রামান্তরে পৌছাইয়া আসিল।

আমার পাঁচ বৎসর কয়েক মাসের ছোট আশু, পিতামাতার প্রথম পুত্র। তাহার জন্মের পরেই বাবা মার এমনি কঠিন পীড়া হইয়াছিল, যে জীবন সংশয়। তাঁহারা যদি ঈশ্বর কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিলেন, তখন আবার নবপ্রসূত শিশুর জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। পরিবারস্থ সকলে যেখানে যে গণৎকার ওঝা বৈদ্য পাইতে লাগিলেন, তাহাকেই আনিয়া জীবন রক্ষার নানা প্রকার উপায় দেখিতেছিলেন। ভাগ্যগণনায় উঠিয়াছিল যে শিশু অতি ভাগ্যবান ও ফাঁড়া যদি কাটাইয়া উঠে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনের ফলাফল বড় "ইউনিক"। ঝাড়া, জলপড়া, সেকালের যাহা কিছু শিশু চিকিৎসা ছিল তাহাতেই শিশু সারিয়া শেষে বেশ সুস্থ সবলকায় হইয়া উঠে। আমাদের জন্ম মাতামহালয়ে; ছয় মাস বয়সে পিত্রালয়ে যাওয়া প্রথা। আশুকে লইয়া মাও সময় মতন হরিপুর রওনা হইয়া গেলেন। শুভ দিনক্ষণ দেখিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করা হইল। পুরাতন নিয়মানুসারে বাদ্য বাজাইয়া পূর্ব্বে কাছারী বাড়ীতে তুলিয়া গ্রামের গুরুজন সকলে দেখিলে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইত ও প্রধান প্রধান প্রজারা কিছু কিছু নজর সম্মুখে ধরিত। আশুরও তাহাই হইয়াছিল। শিশুর হাতে টাকা দিলে কখনও মুষ্টিবদ্ধ করিতে পারিত না, শুনিয়াছি। জীবনে তাহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ।

আশুর জন্ম বৎসরেই আমার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ৺নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদার * প্রথম বিবাহ অতি সমারোহে হয়। পিতৃদেব সে বিবাহে সবই করিয়াছিলেন ও বাড়ীর সকলে তাহাতে ভাবিয়াছিলেন, জ্যাঠা মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশনে খুব ধূমধাম করিবেন। কিন্তু নববধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর মুখে ভাত দিবার প্রস্তাব শুনিয়া পিতা অভিমানে তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন, সে যাত্রা অন্নপ্রাশন রহিত হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণপুত্রের দশকর্ম রীতিমতন না হইলে চলিতে পাবে না। জাঁকজমকে

* আমাদিগের অঞ্চলে বড় ভাই, কাকা, মামাদিগকে মান্য করিয়া "ঠাকুর দাদা, ঠাকুর কাকা ও ঠাকুর মামা" বলিয়া ডাকে। আর তেমনি দিদিকে "ঠাকুরাণী দিদি", কাকীকে "ঠাকুরাণী কাকী", মাসী, পিসী, মামী প্রভৃতি "ঠাকুরাণী মাসী মা", "ঠাকুরাণী পিসী মা" ও "ঠাকুরাণী মামী মা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্নপ্রাশন না হইয়াও আশুর মুখে ভবানীপুরের (নাটোর রাজের দেবস্থান) প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল এবং পিতৃদেব স্বয়ং নাম রাখিলেন "আশুতোষ"। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তানের অন্নপ্রাশন আশানুরূপ হইল না, তাহাতে মা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইলেন না, বরং ভবানীদেবীর প্রসাদই, তাঁহার আশীর্ব্বাদস্বরূপ পুত্রের মুখে দিয়া তিনি পরিতুষ্ট বোধ করিলেন। পিসিমাতারা ইহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও সেজন্য ভাবীকালে একটা গৃহ বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া রহিল।

আশুর পরে যোগেশ, তিন বৎসরের ছোট। এবার পিতৃদেব পিসিমাতাদিগের হস্তে দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশনের ভার দিয়া বনগ্রামে কার্য্যস্থানে রহিয়া গেলেন। শাস্ত্রানুসারে জ্যেষ্ঠের উচিতরূপে "নান্দীমুখ" "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ" না করিয়া অন্নপ্রাশন হইলে কনিষ্ঠের তাহা হইতে পারে না। অগ্রে আশুর হইয়া ছোট ভ্রাতার মুখে ভাত দিতে হইবে। পুরোহিত মহাশয়েরা পাঁজি, পুঁথি খুলিয়া তাহার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, আর গৃহে কুটুম্ব আগমনের ধূম পড়িয়া গেল। এ অন্নপ্রাশনে বড় আমোদ, যুগল কুমার লবকুশের ন্যায়। সাড়ে তিন বৎসরের আশুতোষ সর্ব্বাঙ্গে গহনা ও লাল পোষাক পরিয়া চন্দনচর্চ্চিত ললাটে ছোট পুঁটে বর সাজিয়া চিত্রিত পিঁড়িতে ভাত খাইতে বসিয়া গেল। যোগেশ নয় মাসের, জ্ঞাতি ক্রোড়ে রহিল। সম্মুখে পঞ্চ ব্যঞ্জন ও উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী সব সজ্জিত দেখিয়া ক্ষুদ্র আশু স্বুবর্ণ অঙ্গুরীয় পরিয়া জ্ঞাতি হস্তে পরমান্ন খাইবার প্রতীক্ষায় না রহিয়া দিব্য খুসি মনে নিজহস্তে অন্নপ্রাশনের অন্নব্যঞ্জন খাইতে লাগিল। এই কৌতুকাবহ দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। রসনচৌকী নহবৎ বাদ্য থামিয়া গেল এবং আশু, যোগেশের, অন্নপ্রাশনের গল্পটা পল্লীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আশুর অন্নপ্রাশন সাড়ে তিন বর্ষে, ও হাতে খড়ি একেবারেই হয় নাই। তবুও মা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর কৃপায় কখন বঞ্চিত নহেন।

আমার জ্যেঠিমাতা ৺কুলসুন্দরী দেবী গ্রামের ভিতরে সর্ব্বাংশে পূর্ণমাত্রায় গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার গুণে গ্রামান্তর হইতে ভদ্রলোক আসিয়া বিবাহ ব্যাপারে ভোজ ফলাহার সামাজিকতায় কত লোকের নিমন্ত্রণে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন এবং কি প্রকারে আয়োজন করিতে হইবে সব জানিয়া যাইত। তিনি রন্ধনে দ্রৌপদী, পাঁচ সাত শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ভোজ অনায়াসে রন্ধন ও পরিবেশন করিতে পারিতেন, তাহাতে তাঁহার ধৌত বস্ত্রে একটু মাত্র মলিনতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে কখন জলগ্রহণ করিতেন না ও সে দীর্ঘ উপবাসে তাঁহার দেহ মনে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইত না, অতি পরিতোষ পূর্ব্বক সকলকে ভোজন করাইয়া শ্রম সার্থক জ্ঞানে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইতেন। ব্রত নিয়ম পূজা আহ্নিক নিত্যকর্ম্ম ছিল, দানে মুক্ত হস্ত, কত অনাথা বিধবাকে গোপনে প্রতিপালন করিতেন। কতদিন নিজ আহারীয় অন্ন

ব্যঞ্জন দীন দুঃখীকে খাইতে দিয়া হাস্যমুখে অমনি থাকিয়া যাইতেন। গ্রামের নিরাশ্রয়ের রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা শুশ্রূষায় আত্মোৎসর্গ করিয়া দিতেন তাহাতে কখন ক্লান্তি ছিল না। গৌরবর্ণা সবল দীর্ঘকায়, নীরোগ শরীর আদর্শ সাধ্বী নারী, সর্ব্বত্র পূজনীয়া ছিলেন। "নবকুমারের মাকে" না চিনিতেন এমন লোক ও প্রদেশে ছিল না। সহসা অসময়ে একদিন হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া দেখা দিল। তাঁহার রোগের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার হইবামাত্র কত লোকজন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গা পূজার উৎসব মধ্যে সহসা একদিনে তুলসী তলায় নামামৃত শ্রবণ করিতে করিতে সৌভাগ্যবতী পতি পুত্র কন্যা ও অপরাপর আত্মীয়স্বজন সব রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুশোকে মাতৃহারা হরিপুর চিরতরে রোদন সার করিল। তাঁহার অভাবের শূন্যতার শ্রীহীন বড় তরফের অন্ধকার আর দূর হয় নাই। জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুর করাল ছায়া আমার বালিকা হৃদয় অন্ধকার করিয়া ফেলিল। জ্যেঠিমাতার বৃদ্ধা জননীর সেই বিলাপ ধ্বনি আজিও যেন গভীর নিশীথে প্রাণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত শুনিতে পাই। সে যে কি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন রব ও সর্ব্বজন ব্যাকুলিত কাতরতা, বাক্যে তাহা বুঝাইতে পারি না। সন্তান বিয়োগ বিধুরা মাতা ভিন্ন কে বুঝিবে আর? ভাষায় প্রকাশ করিবার সাধ্য এ জগতে আমার কিম্বা অন্য কাহারো নাই। কন্যার অকাল মৃত্যু শোকে পুণ্যবতী তপস্বিনী "আইমা" তিন মাস মাত্র জীবিত ছিলেন।

আমাদিগের দেশে পুত্র কন্যা স্বামী বিদ্যমানে মৃত্যু হইলে শ্মশানে লাল ধ্বজা উড়াইয়া তাঁহার সৌভাগ্য জ্ঞাপন করা নিয়ম ও নূতন শূর্পোপরি নব-ধান্য, অলক্ত, সিন্দুর, রক্তাম্বর ও হস্তের লৌহশঙ্খ সধবার চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত হয়। জ্যেঠিমাতার সেই সকল নিদর্শন বহু দিবস শ্মশানে অমনি ছিল এবং প্রবাস প্রত্যাগত আত্মীয় স্বজন তাহা দেখিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেন। আমরা যাহা হারাই তাহা কখনই ফিরাইয়া পাই না, যিনি চলিয়া যান তাঁহারও স্থান চির অপূর্ণ রহিয়া যায়।

মৃত্যুর ন্যায় বিপদ এ জগতে অন্য কিছুই নহে, যতই আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন করি না কেন, শোক সহ্য করিয়া থাকিতে পারা অতীব কঠিন। জ্যেঠিমাতার লোকান্তর গমনের কষ্টে এবং অনিয়মে আমার তৃতীয় ভ্রাতার অপূর্ণকালে অষ্টম মাসে জন্ম হয়। মাসের এ অপূর্ণতায় তাহার তখন কোন ক্ষতি হয় নাই, নাম দেবেন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছিল। বালক সুস্থ সবল সুন্দর ও অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালী এবং মেধাবী ছিল। এক বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া তিনবার প্রমোশন পায় ও অপূর্ব্ব প্রতিভা-গুণে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যশোহর স্কুলে গৌরবান্বিত ও নিম্নশ্রেণীর সর্ব্বোপরি হইয়া বহুতর পারিতোষিক পাইয়াছিল।

জ্যেঠিমাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই অর্দ্ধোদয় যোগ এবং মাঘ মাসের শীত উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের আবালবৃদ্ধ বণিতা পুণ্য স্নানে কানসাট মুরশিদাবাদের সন্নিকট চলিয়া যান। আমার পিতৃ-ষসারাও এ মহাযোগে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তখন জ্যেঠিমাতার পুত্র কন্যা মাতৃহীন "কালীপ্রসন্ন দাদা" ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী "স্বর্ণ দিদি" তাঁহাদের সঙ্গ ধরিয়া মোক্ষ স্নানের সহযাত্রী হইয়া নৌকারোহণ করেন। দাদা দিদির গমন দেখিয়া আমিও উৎসাহভরে তাঁহাদিগের সঙ্গী হই ও প্রথমে লোকা-রণ্যের কোলাহল মধ্যে মা ভাই ছাড়িয়া দূরে যাইবার কষ্ট তেমন অনুভব করিতে পারি নাই, তাহার পর যেমন শত শত তরণী অসংখ্য যাত্রীসহ কলরবে দিগদিগ-ন্তর চমকিত কম্পিত এবং হরিধ্বনি করিতে করিতে নদীবক্ষ খালি করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল দেখিলাম, আমিও অমনি মাতার নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য কান্নার সুর ধরিয়া দিলাম। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িলাম। সায়াহ্নে যখন আবার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অস্তগামী সূর্য্যকরে নদ নদী প্রান্তর এবং আকাশের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ও কুলায় প্রত্যাগত বিহঙ্গমের মধুর সঙ্গীত, রাখালগণের গাভীসহ গোষ্ঠাভিমুখে প্রত্যা-বর্ত্তনের আনন্দধ্বনি শ্রবণে মনে কতক শান্তিলাভ করিলাম। ক্রমে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাণী রাজ্য নীরবে পৃথ্বীসহ যেন বিশ্বপতির ধ্যানে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। কেবল দূরে ও নিকটে নৌকাবহার ঝুপঝাপ শব্দ তালে তালে কর্ণে আসিয়া জীবনের পরিচয় দিতেছিল মাত্র। প্রাণের ভিতর একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেমন বেদনানুভব হইতে লাগিল অথচ ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি কিছু ছিল না।

মা ও ভাইদিগকে ছাড়িয়া অজ্ঞাত দূরদেশে গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতিশয় বিষণ্নতা আনয়ন করিয়াছিল। মাতৃহীন দাদা দিদির স্নেহ মমতায় দিবসে যতই কেন চুপচাপ থাকি না, রাত্রে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়া যাইত। দাদা দিদি তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। দিদি একাদশ বর্ষীয়া বালিকা, "স্বর্ণময়ী" ত স্বর্ণময়ী, দ্রবীভূত সুবর্ণে গড়া মনোহর মানসী প্রতিমা। "ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়া আঁকা, তার উপরে কিবা শোভা ভ্রূযুগ বাকা"। কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ কলাপ সেই সুন্দর মুখের দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছিল। প্রস্তরে কুদিয়া যেন ভাস্কর সে কন্যারত্ন গড়াইয়াছিল। তিনি এমনি ভক্তিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন যে দেবতার পায় পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া সেই এগার বৎসরের বালিকা কদাপি জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার অন্তর দয়াতে দ্রবীভূত ছিল, দাস-দাসীকে বকিতে শুনিলে করুণাময়ী দিদি কাঁদিয়া ফেলিতেন ও বলিদানের রক্ত দেখিলে মূর্চ্ছাগত হইতেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয় কালী-প্রসন্ন দাদার পরিচয় ত পূর্ব্বেই দিয়াছি। কিশোর বালক "বাদলের" ন্যায় বীর

প্রকৃতি ও উন্নত চরিত্র গুণে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন।

প্রথম দিন কানসাট পুকুরের গঙ্গাতীরে যাত্রীর নৌকার সারি লাগিয়া গেল। অসংখ্য পান্‌সী, অগণিত মনুষ্য ও চারি পার্শ্বে দোকান পাট, হাট বাজার বসিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। যাদুমন্ত্রে যেন সাহারার মরুভূমে মায়া রাজ্য সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বের সেই জনশূন্য সৈকতে, বালুকান্তরে ভক্ত যাত্রীগণ মহানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। "কানাট" (তাম্বু) ফেলিয়া, বস্ত্রনগরীতে কেহ তিনদিন কেহবা সপ্তাহ কাল গঙ্গাবাসের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কলনাদিনী ভাগীরথী এই জন কোলাহলের সহিত ঐক্যতানে যোগ দিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে আত্মমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুণ্য স্নানের জন্য যেন সবাইকে আহ্বান করিতেছিলেন। আমরা ছোট ছোট বালক বালিকারা উৎসাহভরে তাম্বুতে তাম্বুতে ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। অধিকাংশই নারী, পুরুষের সংখ্যা ততোধিক নহে। সে যে কি উৎসাহ, কি ভক্তি, কি আনন্দ কলরব ধ্বনি স্বচক্ষে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করেন নাই তাঁহাকে বুঝাইতে পারা শক্ত।

দ্বিতীয় দিন যোগের মোক্ষ স্নান। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া সেই সংখ্যাতীত যাত্রীর দল, নর নারী, যুবক বৃদ্ধ, বালক বালিকা জাহ্নবীতট ঘিরিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখেই "মাতঃ শৈল সুতে" ধ্বনি। পতিতপাবনী ভাগীরথীও সেই দিন পুণ্য স্নানে বিশ্বসংসারকে মুক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য যেন মনে মনে প্রয়াসী ছিলেন। মানুষের ইচ্ছা, ভগবানের নিষ্পত্তি। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, নির্ভর তাঁহারই উপর এই সার সত্য।

স্নান দান হরি সঙ্কীর্ত্তন ও মহাসমারোহে গঙ্গা পূজা চলিতে লাগিল। "স্বর্ণ-দিদি" পিসিমাতাদিগের সহিত সমানরূপে সব করিয়া অনশনে থাকিয়া রাত্রি শেষে হঠাৎ দারুণ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ডাক্তার বৈদ্য নাই চিকিৎসা হইল না। অকালে অসময়ে প্রবাসে পরিবারের বক্ষ খালি করিয়া অতি প্রত্যুষে অনিন্দিত স্বর্ণকুসুম জাহ্নবী তীরে ঝরিয়া পড়িলেন। এই অভাবনীয় বিপদে পিসিমাতারা শোকে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া বালুচরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের আর্ত্তনাদে আকাশ পাতাল কম্পিত হইয়া উঠিল। কে কাহাকে সান্ত্বনা দেয়? সবাই নিজের পুত্রকন্যা লইয়া বিব্রত এবং দেখিতে দেখিতে সেই জন কোলাহল থামিয়া গেল ও চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া সকলে পালাইয়া যাইতে লাগিল। সেই এক দিনের মধ্যেই মহামারী সর্ব্বগ্রাসী সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া যাত্রীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল।

আমাদিগের নৌকায় আগেই সেই কালরোগ দেখা দিয়াছিল এবং আবার কালীপ্রসন্ন দাদাকে রাত্রে আক্রমণ করিল ও প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিনিও সকলের হৃদয়ে নিদারুণ শোক শেল বিদ্ধ করিয়া বীর বালক দিব্যধামে চলিয়া

গেলেন। এই অকাল মৃত্যুশোকে পিসিমাতারা ত পাগল হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত চিৎকার ও রোদন ধ্বনিতে শয্যাগত হইয়া রহিলেন এবং এ সংবাদ বায়ুবেগে নাটোর রাজধানীতে আমার জ্যাঠামহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যা আশ্রয় করিলেন। পিতৃদেবের নিকট বনগ্রামে (পূর্ব্বে নদীয়া জেলা, এক্ষণে যশোহর) তাড়িতযোগে এ বার্ত্তা পৌছিল। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শোকে রাজকর্ম্ম ছাড়িয়া নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই দুর্ঘটনায় জ্যেষ্ঠতাতের বংশ প্রায় লোপ হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্যেষ্ঠ নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদা মহাশয় তখন একা জীবিত ছিলেন। এক্ষণে দাদার পুত্র শ্রীমান সুশীলকুমার ও তাহার সন্তানগণ বংশে বর্ত্তমান।

সেই অর্দ্ধোদয় যোগে আমাদিগের পরিবারে ছোট দাদা, দিদি, ৺হরকান্ত চৌধুরী ছোট কাকা মহাশয় ও এক ভগিনীপতি বিপিন লাহিড়ী, অকালে পরলোকগত হইলেন। অনেক লোকই মারা গেল কিন্তু ইঁহারাই প্রধান। আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতিবর্গ দাসদাসী এবং নৌকার মাঝি মাল্লা কত যে মারা পড়িল তাহা এখন বলা কঠিন। ধরিতে গেলে গ্রাম মহামারীতে উজার হইয়া গিয়াছিল এবং যখন গঙ্গাযাত্রীর নৌকা সব ফিরিয়া বড়াল নদীর তীরলগ্ন হইল তখনকার সে বিলাপ ও করুণ ক্রন্দন রবে গ্রামের চিরশান্তি ভঙ্গ হইয়া গেল। পুত্র শোকাতুরা জননীর হাহাকার, বালবিধবার ভগ্নহৃদয়ের উচ্চ রোদন ধ্বনি এবং সর্ব্বজনীন শোকের সে আর্ত্তনাদ ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। সে অতীত যুগের দুঃখ কথা আজও কখন উঠিলে অন্তর বিদীর্ণ হইয়া চক্ষু জলে ভরিয়া যায়, তাহা আর বলিব কিরূপে? সেই দারুণ শোকের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া আমার বড় পিসিমাতা ৺করুণাময়ী দেবীও সেই বৎসরই গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। এইরূপ এক এক পুণ্যযোগে বঙ্গমাতার বহু সন্তান সন্ততি ইহলোক হইতে চলিয়া যাইয়া গ্রাম নগর শূন্যময় করিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম্মান্ধ গভীর বিশ্বাসী হিন্দুগণ আজীবন ভাগীরথী স্নানের সুযোগ কখন ত্যাগ করেন না এবং মুক্তি লাভার্থে সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া লোকান্তরের মোক্ষ সঞ্চয় করেন। ধর্ম্মে কি অটল বিশ্বাস।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে শোক দুঃখের ঝড় ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে পিতৃঠাকুর প্রবাসে আর একা থাকিতে না পারিয়া আমাদিগকে কর্ম্মস্থান বনগ্রামে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। শুভদিন তিথি নক্ষত্র দেখিয়া আমাদের যাত্রা স্থির হইয়া গাড়ী পাল্কী লোকজন সব প্রস্তুত হইলে আমরা বাল্যের সুখ নিকেতন, ক্রীড়া সঙ্গী এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর পিতৃষসাদিগকে ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইলাম। তৎকালে কুষ্টিয়া রেলগাড়ী উঠিয়া চক্রদহ (চাকদা) নামিয়া পাল্কীযোগে বনগ্রাম যাইতে হইত। আমাদেরও তাহাই করা হইল। তখন পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজ জাতির কাহাকেও কখন চক্ষে দেখি নাই। পরিপাটী সুসজ্জিত নূতন ষ্টেসন, চারিদিকে কল কারখানা এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য শ্বেতাঙ্গ

নরনারী। দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বেশভূষা চলন ধরণ ও ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে ভয়েরও সঞ্চার হইল। মঙ্গোপার্ককে অতিথিরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কাফ্রি রমণীগণ যেমন অবাক হইয়াছিল আমাদিগেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। এমন শ্বেতবর্ণ মানব কোন্ রাজ্যের ও যদি তাহাদের দেশে আমাদের কখন লইয়া যায় তাহা হইলে সে অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আর ফিরিবার কোনই উপায় নাই, "সাত সমুদ্র তের নদী পার" হইয়া যাওয়া আসা কত অসম্ভব কার্য্য; আশু কেবল তাহাই বলিয়া একটু ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া মায়ের পার্শ্বে রহিয়া গেল, অন্য কিছু দেখিবার জন্য উঠিল না। যোগেশ, দেবেন্দ্র তখন বড় ছোট, ছেলেধরার ভয়ে দাসীর ক্রোড়ে নীরবে ভীতভাবে বসিয়া রহিল। আমার অন্তরেও খুব ভয় হইয়াছিল, তবে "দিদি" বলিয়া মুখে কিছু প্রকাশ করি নাই। মেম, সাহেব কি, ও কোন্ দেশীয়, কে ইহারা, চাকর দাসীরা তাহাদের "সাহেব সাহেবানী" নাম করণ করিয়া দিল, নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমরা. তাহাই বলিতে লাগিলাম।

আমার মাতামহকুলে কেবলমাত্র মায়ের এক "দাদি" (দিদি) চতুর্দ্দশ বর্ষের বালবিধবা—আমাদিগের মাসীমাতা ৺দ্রবময়ী দেবী ছিলেন এবং এ বিদেশ বাসের তিনিই মাতার সঙ্গিনী এবং অভিভাবিকা স্বরূপ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মাতৃষসা চির ব্রহ্মচারিণী, আজন্মকাল পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া একাহারে পূজা আহ্নিকে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। "আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" কাটিয়া মুণ্ডিত মস্তকে সে কালের "ঠেঁটি" ছোট মোটা ধুতি পরিয়া থাকিতেন ও অতি প্রত্যুষে শত সহস্র ঠাকুর দেবতার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহ কার্য্যে রত হইতেন। রন্ধনে সিদ্ধ হস্ত, এমন সুস্বাদ মিঠাই মোণ্ডা ও অন্ন ব্যঞ্জন কেহ প্রস্তুত করিতে পরিতেন না এবং ধনী দরিদ্রকে সমানভাবে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। "পৈতাকাটা" সুজনাই শিলাই, বিবিধ নারিকেলের মিষ্টান্ন ফুল ফল "চিড়া জিরা" প্রভৃতি এরূপ সুন্দর তৈয়ারি করিতে জানিতেন যে তিনি কোন কুটুম্বিতায়, বিবাহ, উপনয়ন কিম্বা অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে সর্ব্বাগ্রে আত্মীয়স্বজন তাঁহাকেই লইয়া যাইতেন। তাঁহার নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকং" ছিল। দাস দাসীর রোগ শয্যার পার্শ্বেও বসিয়া অবিশ্রান্ত সেবায় কত দিন যে অনাহারে গিয়াছে তাহা গণনা করিতে পারি না।

"সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির।
বিদেশের নরনারী এদেশে আসিত,
পতিব্রতা প্রতিমূর্ত্তি নয়নে হেরিত।
লিখিলাম নিরদেশে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে,
রমণী এমন আর ধরাতলে নাইরে।"

মাসীমাতার সম্বন্ধে ইহা প্রত্যেক বিষয়ে বলিতে পারা যায়। তাঁহারই স্নেহ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও তাঁহার হস্তের অন্ন ব্যঞ্জনে আমরা এত বড় হইয়াছি। তিনি আমাদিগের মাতৃরূপিণী মাসীমা। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে নতশিরে বারম্বার প্রণাম করি। তিনি ইহলোকে দুঃখীর আশ্রয় ও আমাদিগের জননী ছিলেন, এক্ষণে লোকান্তরে সেই পুণ্যবলে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিতেছেন এই আশা। তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধ ছিল কালীঘাটের গঙ্গাতীরে মৃত্যু, যেখানে তাঁহার স্বামী শ্বশুরঠাকুর শ্বশ্রূদেবী ও ভাসুর মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্মৃতিময় শ্মশানে তাঁহারও শেষ কার্য্য আমার ভ্রাতাগণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, সুহৃদ, পুত্রবৎ স্কন্ধে বহন করিয়া গঙ্গাঘাটে লইয়া স্বয়ং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সামাধা করিয়াছিল, গয়াতে পিণ্ডদানও হইয়া গিয়াছে।

বনগ্রামে আমাদিগের রীতিমতন লেখাপড়া আরম্ভ হইল। পিতৃদেব স্বয়ং গুরু ও আমরা সব শিষ্য। প্রাতে স্কুল বসিত, সায়াহ্নে পড়া দিতে হইত এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশীল আশু সর্ব্বোপরি থাকায় আমরা একটু ভীত থাকিতাম। পড়া দিবার ঐ সময় প্রায়ই মা আমার বেণীবন্ধন করিতেন ও রচনার কারুকার্য্যে বিলম্ব হইয়া যাইত। সেকালের খোঁপার নাম "জিলাপী পাক, মোড়া এবং বিবিয়ানা"। কপালের ও কাণের পার্শ্বের চূর্ণিত কুন্তলের বেণীর পরিপাট্যে দেরী হইবার কথা ও তাহাতে আশুর নিকট আমার পড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইত। সেটা দণ্ডস্বরূপ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতাম। ছোট ভাইএর গুরুগিরি আমার ভাল লাগিত না, চক্ষের জলে সমস্ত বস্ত্র ভিজিয়া যাইত, রাত্রে আহার প্রায়ই হইত না, তথাপি পিতৃঠাকুরের কথার অবাধ্য হওয়া ও তাঁহাকে অমান্য করা সাধ্যাতীত। নীরবে আশুর মাষ্টারী মানিয়া লইতাম। গদ্য- পদ্য ভূগোল ইতিহাস ও লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষ ছিলাম, কেবল অঙ্কে নীচে থাকিতাম ও পরে ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত উঠিয়া সেই খানেই বিদ্যা থামিয়া গেল। ইংরাজী তখনও পড়িতাম না। আশু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া নিয়মমত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। আমি গৃহের পাঠশালেই তেমনি রহিয়া গেলাম।

সেইবার ৭১ কি ৭২ সনের আশ্বিন মাসের দুরন্ত ঝড়ের বৃত্তান্ত এখন আর তেমন স্মরণ নাই। সে ঝড়ে অসংখ্য লোক নৌকা ডুবিতে মারা যায়, ঘরবাড়ী বৃক্ষ সব কত যে লোকসান হইয়াছিল, তাহার কোন ঠিক হিসাব নাই। সম্মুখে দুর্গাপুজায় প্রবাসীরা মনের সুখে পরিজনসহ নৌকাযোগে গৃহ প্রত্যাগত হইতেছিল, দারুণ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া সব প্রাণ হারাইল, নৌকা ভাঙ্গিয়া শবদেহ সকল বালুচরায় রহিয়া গেল, কাহারো জীবন আর রক্ষা হইল না। আমরা বনগ্রামের বাঙ্গালা ঘরে থাকিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম, আমাদিগের

মূল্যবান আসবাব সমূহ ও বাড়ী যাইবার দুই তিনখানা নৌকা পদ্মাগর্ভে অতল জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছি সেবারে নাটোর রাজের গুরুদেব "গোঁসাইজি" জামাতা পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহকারে নৌকা ডুবিয়া মারা যান এবং অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। এমন প্রবল ঝড় সেকালের বৃদ্ধেরাও নাকি দেখেন নাই। এক একটী যুগে এক এক দুর্ঘটনা এমনি হয় যে তাহা ইতিহাসের বক্ষে অঙ্কিত রহিয়া যায়। যেমন সাতাত্তরের মন্বন্তরায় সোণার বাঙ্গালা ছারখার করিয়াছিল এও সেই প্রকার।

বংশ পরম্পরায় আমাদিগের গৃহের প্রথানুসারে আমারও কুলীনপাত্রে বিবাহ হইয়াছিল। চিরন্তন পদ্ধতি সহসা তুলিয়া দিতে পারেন নাই। বড় তরফে তখন আমিই একমাত্র কন্যা, "স্বর্ণদিদির" প্রাপ্যটাও আমার অংশে পড়িয়াছিল। আমার পূর্ণ দশবর্ষ বয়স, বিবাহের জাঁক জমক সমারোহ দান ভোজ ফলাহার ও লোক লৌকিকতা আরব্য উপন্যাসের গল্পের ন্যায় অভূতপূর্ব্ব। কুলীন পাত্রের কুলভঙ্গ করিবার নাম "করণ"। অধিকাংশ স্থানে ধনবানের কন্যা গরিব কুলীন পাত্রে বিবাহ দিবার পূর্ব্বে আত্মীয় বন্ধু গুরু ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে নদী কিম্বা দীর্ঘিকার জলে হাঁড়ীতে চাউল তিল ইত্যাদি দিয়া কন্যাকর্ত্তা ভাবী জামাতার সহিত তাহার কুল অতল জলে ডুবাইয়া দেন। যাঁহার কুল নদী গর্ভে নিমগ্ন করা হয় তাঁহার দুঃখিত ও লজ্জিত হইবার কথা তবে ধনলোভী কুলীনগণ তাহা গ্রাহ্য করেন না এবং এই অসামঞ্জস্য বিবাহে ভবিষ্যতে অসুখী হইয়াও থাকেন। এ প্রকারে কন্যাদানের অনিশ্চিত ফলাফল বংশমর্য্যাদা রক্ষার্থে পিতামাতাও মনে করেন না। সামাজিক নিয়ম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দেওয়া ত বড় কঠিন। এখন আমাদের বংশেও এ প্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বিবাহ পরে আবার আমরা বনগ্রামে আসিলাম, শ্বশুরালয় যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথা সে সময় উঠিল না, ভবিষ্যতে সে বিষয় স্থির হইবে শুনিলাম। সেই বৎসর বনগ্রামে ভ্রাতা কুমুদের এবং ক্রমে প্রমথ, মন্মথ সেনের এবং মৃণালিনীর জন্ম হয়। পিতৃদেব যশোহর বদলী হইয়া যান ও সেইখানে এই তিন জনের এবং প্রিয়রও জন্ম হইয়াছিল। ছয় ভ্রাতার বড় আমি, সেইজন্য আমার আদরটা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ছিল। তাহাতে লেখা পড়ায় কখন আমি অবহেলা করি নাই বরং জীবনের পরিবর্ত্তন সহ আরো যত্ন ও মনোযোগ সহকারে তাহা করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সকল স্থানেই একটু নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে পছন্দ করিতেন এবং আমরা ভাই বোনে একত্র খেলা ও পাঠাভ্যাস করিতাম, অন্য কাহারো সহিত মিশিতে পাইতাম না। আমাদের নিকট নিজের আত্মীয় বালক চারি পাঁচ জন থাকিত, তাহারাই ক্রীড়াসঙ্গী এবং সহপাঠী ছিল। বাল্য স্মৃতি মনুষ্য জীবনের একটা সুখের সামগ্রী, সেদিনের কথা আজও হৃদয়ে কেমন আনন্দ আনয়ন করে।

ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর এক বৈদ্যরাজ সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। এই সব ভদ্র লোকের বাসে বাড়ীর নিম্নতলাটী দিব্য গুলজার ছিল। কবিরাজ মহাশয় গীত বাদ্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং সরস কথা বার্ত্তায় পিতার বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী বালক আশু দু'চারি দিবসেই দ্বিতীয় শিক্ষকের বিদ্যাবুদ্ধির মর্ম্মটা বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। তাঁহার হাস্যজনক কৌতুকাবহ বাক্যালাপে ও আত্মবিস্মৃত ভাব দর্শনে তিনি যে একজন বিলক্ষণ পুষ্পগন্ধ বিশিষ্ট (Fool) তাহা প্রতীয়মান হওয়ায় গৃহের অন্যান্য বালকদিগের নিকটে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষক তলাপাত্র মহাশয় "পাগলা মাষ্টার" "ক্ষ্যাপা সার" নামে অভিহিত হইয়া বড় গোল করিতে লাগিলেন। আশু ভিন্ন সমগ্র ছাত্রবৃন্দ তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তাঁহার নিত্য কার্য্যের অত্যাচার বিবরণ দিয়া রিপোর্ট করিল। সেই রিপোর্টের সার কথা, অকারণ "ছেলে প্রহার ও অসাধারণ রাগী মাষ্টার"। তাহাতে মহা আন্দোলন বিপাকে "আদাড়ে Sir কে" কার্য্যত্যাগ করিতে হইল। তাহার পর আদালতের উকীল, মক্কেলের সহিতও বনাইতে না পারিয়া মুন্সেফ হইলেন এবং পরিশেষে মহাপ্রস্থান করিলেন।

ক্রমে আমাদিগের গৃহ শিক্ষকের পদ পিতৃদেব স্বয়ং আবার গ্রহণ করিয়া অতি পরিশ্রমসহ রাত্রি দিন আশুকে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বাদে অন্যসব সাহিত্য ইতিহাস পড়াইতে লাগিলেন ও তাহার দ্রুত উন্নতি দেখিয়া স্কুলে "ডবল প্রমোসান" হইতে লাগিল। তখন ষোল বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ম ছিল। সেই জন্য তাহাকে তিনবৎসর বসিয়া থাকিতে হয়। সেই কয়েক বৎসর মধ্যে আশু অনেক পড়িয়া অনেক শিখিয়া একটা বিজ্ঞবালক হইয়া উঠিল। "বয়সে কি বিজ্ঞ হয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে" এবাক্য তাহার পক্ষে খাটিয়াছিল।

আমার জন্য এবার পৃথক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক ফিরিঙ্গী মেম নিযুক্ত হইয়া ইংরাজী ও শিল্প কার্য্য শিক্ষা দিতে আসিলেন। তাঁহাকে বাড়ীর লোকে "ববের মা" বলিয়া ডাকিতেন, যেমন দেশের পদ্ধতি, পুত্র কন্যা বড় হইলে মেয়েরা মাতৃপদ লাভে তাহাদের নামে কথিত হইয়া থাকে, এও সেই প্রকার। শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে লেখা পড়া হউক আর নাই হউক বিদেশী ফ্যাসানটা বেশ আয়ত্ত হইয়া গেল। পূর্ণমাত্রায় অনুকরণ করিতে ছাড়ি নাই, এখন তাহা নিজেই স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। "ববের মা" রোম্যান ক্যাথলিক, তাঁহার উত্তেজনায় আমরা সকলে মিলিয়া একদিন চার্চ্চে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, আমাদিগের সম্মানার্থে সে দিন বাঙ্গালায় বক্তৃতা হইল। সেরূপ অপূর্ব্ব উচ্চারণ ও অদ্ভুত বঙ্গভাষা জীবনে কখন শুনি নাই। পাদরী মহোদয় ভাব ভঙ্গী সহকারে বলিতে লাগিলেন, "ভাক জানানাগণ, সয়টান ভারের লিকটে, প্রভুর প্রেরণ, ট্াহার টর্ম্ম টোমরা লইবে কিনা বোলো?

ঘৃট যেমন আগুনে গলে যায় টেমনি টোমরা নরকে গলে যাবে, সয়টান চুলে ঢরিয়া বেটম্বিকে লয়ে যাবে, গরম লোহা ডিবে।" এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণে, বুন, বাগদী ভক্তগণ একেবারে ক্রন্দনে কল্লোলে ধর্ম্মমন্দির প্লাবিত ও কম্পিত করিতে লাগিল। আমরাও উপদেশের উচ্ছ্বসিত ভাষায় এবং বক্তৃতার উৎসাহে কোনরূপে হাস্য সম্বরণ করিয়া উত্তেজনায় তপ্ত ঘৃতের ন্যায় গলিয়া গৃহে যাইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলাম। "সয়টান চুলে ঢরিয়া" আজিও "নরকে" লইতে পারে নাই।

আমাদিগের এই ভজনালয়ে গমনবার্ত্তা যশোহরময় রাষ্ট্র হইয়া মহা হৈঃ চৈঃ পড়িয়া গেল এবং দলবদ্ধ ভদ্রলোক সব ইহার সারতত্ত্ব জানিতে আসিতে লাগিলেন। আমরা খ্রীষ্টধর্ম্ম কখন গ্রহণ করিব না ও করিতে পারি না সে জন্য গির্জ্জায় যাই নাই বলিয়া তাঁহাদের বিদায় করা হইল। "Save me from my friends" যখন অবস্থা তখন দুর্দ্দান্ত মনরো সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে পুলিশের সর্ব্বোপরি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা) পিতাঠাকুরকে পত্র দ্বারা সাদরে আহ্বান করিয়া রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মগ্রহণ করা যে অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য সে বিষয় অনেক উপদেশ দিলেন। হিতে বিপরীত ঘটিল, অগত্যা বেচারি "ববের মাকে" অকালে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা খ্রীষ্টান মেমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম দেখিয়া অযাচিত হিতার্থী বন্ধুগণ যেন শান্তিলাভ করিলেন। তাহার পরও অনেক মিশনারী মেম আমার শিক্ষয়িত্রী হইয়াছিলেন। পিতৃদেব অবসর দিনে বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া শীকারে যাইতেন। বড় বড় বুল কুকুর সহচর, "মেরী হাণ্টার" প্রভৃতি ঘোটক বাহক, সে সময়ে ভ্রাতাগণের উৎসাহ দেখিয়া আমিও যে কখন তাহাদিগের সঙ্গী হইতে চাহিতাম না এমন কথা বলিতে পারি না, দূরে দূরে থাকিয়া দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতাম। এই শীকারের অগ্রগণ্য দলপতি বালক কুমুদ। স্থান অস্থান বোধ ছিল না, গুলিবিদ্ধ শিয়াল তাড়াইয়া তাহার পশ্চাৎ গর্ত্তে প্রবেশ করিত এবং কখন কখন সর্ব্বাঙ্গে কর্দ্দম মাখিয়া শতধাছিন্ন বস্ত্রে শোণিতসিক্ত হইয়া মৃত শৃগালকে টানিয়া বাহিরে আনিত। তীর ধনুক তাহার নৃত্য ক্রীড়ার বস্তু ছিল; বাঁটুল প্রস্তুত মাও করিয়া দিতেন। ডুডু, ব্যাটবল খেলা, লম্ফ এবং সন্তরণ এই সকল পুরুষোচিত খেলায় পিতৃদেব সমানরূপে যোগ দিতেন, আবার তাস পাশাও মধ্যে মধ্যে চলিত, জয় পরাজয়ে মহোৎসব পড়িয়া যাইত। আমি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে কখন যাই নাই, পারদর্শিতার পুরস্কার কি কোন সনন্দ কদাপি ভাগ্যে মিলেও নাই। তবে "প্রাইজ" যাহা পাইয়াছি তাহাও আবার অন্য কাহারো কপালে ঘটিয়াছে কি না জানিনা। পিতৃ বন্ধু পূজ্যপাদ দীনবৎসল স্নেহশীল বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া অতিশয় স্নেহবিগলিত অন্তরে স্বহস্তে তাঁহার যাবতীয় পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। বান্ধবপ্রবর ৺দীনবন্ধু বাবু কৈশোর জীবন পিতৃস্নেহে

অভিষিক্ত করিয়া কত পুস্তক, কত সৌখীন দ্রব্য, কত ক্রীড়া-সামগ্রী দিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ও কতক নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

প্রতি শনি রবিবারে আমাদের গৃহে সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসর জমিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের "সদ্ভাব শতক" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা মৃণালিনী" নবীনের নবজাত "অবকাশ রঞ্জিনী" প্রভৃতির আলোচনা ও আবৃত্তি চলিত। এই মজলিসের প্রধান ছিলেন রসজ্ঞ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়। বটতলার "কি মজার শনিবার"ও এখানে বাদ যাইত না। সে সব অশ্রুতপূর্ব্ব ছড়া আজকাল শুনিতে পাই না। যেমন "গঙ্গা যে ডাটি রিভার হয় সে ফিভার, সে জলে আর কেউ নেওনা,—একটা পুতুল গড়ে মন্ত্র পড়ে ফুল দিয়া আর ফুল (fool) হয়োনা"। আবার চাকুরী সন্তপ্তহৃদয় কেরাণীর কবিতা, "অসুখী ভীষক মন্থপ অতি, অসুখী রূপসী বিধবা সতী—অসুখী যেজন যৌবনে জরা, অসুখের শেষ চাকুরী করা"। বাহির বৈঠকখানায় যখন বাগ্দেবীর বাণী ও বীণা ঝঙ্কারে দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল, তৎকালে অন্তঃপুরে লক্ষ্মী সহায় অন্নপূর্ণার রন্ধনস্থালী বিবিধ মিষ্টান্ন ও সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত—মা ও মাসীমা নিজেরাই অক্লান্ত শ্রমসহ স্বহস্তে সকল প্রস্তুত করিতেন। আমরা ভাই বোনে মিলিয়া দুইদিকের রসাস্বাদনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম। অন্দরে সব পরিবেশন শেষ হইলে আহারের জন্য বন্ধুগণ একত্র প্রীতি ভোজনে বসিতেন। সে সময়ে হাস্যোচ্ছ্বাস ও আমোদজনক গল্পের লহরী বহিয়া যাইত। মিত্রজা এক একটা সরস গল্প বলিতেন আর চতুর্দ্দিক হইতে উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া উঠিত। ইহার মধ্যেও ভোজনের কোনদিকে কোনরূপ শৈথিল্য দেখা যাইত না। মাংসের গরম চপ্ পাতে পড়িবামাত্র উর্ষ্টার সস্ (Worcester sauce ঢালিয়া তাহা উপভোগ করিতেন।

একবার শ্রীপঞ্চমী বন্ধে আমাদিগের যশোহর ভবনে ৺দীনবন্ধু বাবু লীলাবতীর নদেরচাঁদের অংশটা (part) অভিনয় করিয়াছিলেন। নাটক অভিনয় আমরা পূর্ব্বে কখন দেখি নাই ও তাহার কোন ধারণাও ছিল না। কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কবির লড়াই, আখড়াই, হাফ আখড়াই, মনোহরসই এবং ঢপের গান শৈশব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলাম। এ আমাদের নিকট নূতন দৃশ্য। গ্রন্থকর্ত্তা নদেরচাঁদ সাজিয়া হাব-ভাব সহকারে অভিনয় করিবেন শুনিয়া আমরা সর্ব্বাগ্রে রঙ্গস্থল অধিকার করিয়া বসিলাম। ক্রমে বৈঠকখানা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। পিসিমাতারা পর্য্যন্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। "লীলাবতীকে" সম্বোধন করিয়া যখন নদেরচাঁদ "অয়ি হরিণ নয়নে তুমি কি পড়ো" বলিতে যাইয়া যেই "আই মা হরিণের সিং তুমি কি পড়" বলিয়া ফেলিল এবং অপসারিত চৌকীতে বসিতে যাইয়া ভূপতিত হইয়া চীৎকার স্বরে কাঁদিয়া "মলামরে মেরে ফেল্লেরে" * * * বলিল, তখন দর্শকমণ্ডলীর অট্টহাস্যে "যশোর-

নগরী" প্রকম্পিত হইতে লাগিল, তাহার প্রতিধ্বনিতে ভৈরবনদও বোধ হয় উজান বহিয়াছিল। অভিনয় সমাপ্ত হইবামাত্র পিসিমাতারা পিতৃদেবকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তিনি যাইবামাত্র তাঁহারা দুঃখিত ভাবে বলিলেন, "দুর্গা. দীনবন্ধুকে ভাইএর মতন স্নেহপাত্র মনে করি, সে ত খুব ভালই জানিতাম, আজিকার এ কি কাণ্ড? মাংস ভাজার (চপ্) সঙ্গে মদ ঢালিয়া ঢালিয়া খাইয়া এখন ত মাতাল হইয়া রঙ্গভঙ্গ করিয়া মাটিতে পড়িয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও লোকজন হাসাইতেছে, ইহাতে আমরা বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া তোমাকে সব বলিবার জন্য ডাকিয়াছি।" পিতৃদেব তাঁহাদিগের কথায় উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন "দীনবন্ধু মাংস ভাজার সঙ্গে মদ ঢালিয়া খান নাই, ও একরূপ চাটনী (Sauce) মদ না, ইহাকে অভিনয় বলে মাতলামী নহে। বিলাতে কত বড় বড় লোক এই অভিনয় করিয়া রাজদরবারে গণ্যমান্য হইয়া থাকে, কত অর্থ উপার্জ্জন করে, বড় মানুষ হইয়া যায়। দীনবন্ধু রহস্যপ্রিয়, গুণীব্যক্তি, আমাদিগের জন্য তাঁর নিজের বই "লীলাবতী" অভিনয় করিতেছেন।" এই শুনিয়া তাঁহারা ত খুসি হইলেন ও সুচতুর মিত্র মহাশয়ও পিতৃঠাকুর প্রমুখাৎ সকল অবগত হইয়া আমাদের গৃহে আবার নৈশ ভোজনের কথা তাঁহাদিগকেই বলিয়া খুব আপ্যায়িত করিলেন। সে রাত্রির আহারীয় একটু নূতন রকমে প্রস্তুত করা হইল—(নবান্নের নূতন আতপ তণ্ডুলের ফ্যান্সা ভাত ও যত প্রকার সিদ্ধ পোড়া তরকারী, গব্য ঘৃত মিশ্রিত), তাহা খাইয়া একবাক্যে সকলে বলিয়াছিলেন "পোলাও কোথায় লাগে, এ অমৃত।"

দীনবন্ধু বাবু লুসাই যুদ্ধ হইতে অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আর আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, সর্ব্বদা সংবাদ জানিতাম তিনি শয্যাগত। এমনি আশ্চর্য্য ঘটনা, তিনি যে দিন পরলোকগত হন সেই দিবস আমরা হঠাৎ কলিকাতায় "ভারত আশ্রমে" যাইয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু সমাচারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বের সে সব অকৃত্রিম বন্ধুবান্ধব এক্ষণে স্বর্গলোকে, তাঁহাদিগের পিতৃবৎ স্নেহ মমতা নিত্য স্মরণীয় ও শ্রদ্ধার সামগ্রী।

সেকালের পিতৃসুহৃদগণ মাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন, কখন বা আশুর মা বলিতেন, বয়স্য পত্নী বলিয়া কোনরূপ পরিহাস করিতেন না। মুখের সম্মুখে প্রশংসা করা "Compliment দেওয়া", তাঁহারাও সুরুচিসঙ্গত ভাবিতেন না এবং মা-রাও স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের স্তুতিবাদ অতি অনুচিত এবং অশোভন মনে করিয়া লজ্জিত হইতেন। আজকাল মহিলাদিগের মুখের উপর সুখ্যাতি করা (Compliment) একটা নব্য সভ্যতা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কুমারী কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মাতা, বর্ষীয়সী মাতামহীরা পর্য্যন্ত ইহার হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। এসব নবীন পদ্ধতি সুফলপ্রদ নহে, ক্রমে উঠিয়া যাইলে মঙ্গল।

হরিপুর হইতে আমার শ্বশুরালয় গুণাইগাছা চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। স্বচ্ছসলিলা বড়াল নদীর উপরিস্থিত ও প্রকৃতির মুক্ত শোভায় দেখিতে অতি মনোহর। দুর্ভিক্ষ তাহার চতুষ্পার্শ্বে কখন প্রবেশ করিতে পারে নাই এমনি "শস্য-শ্যামলা"। ধান্য ছোলা মটর অপরিসীমভাবে জন্মায় ও হরিদ্রা, সরিষা ফুলে যখন ক্ষেত্রভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে তখন নয়ন ফিরাইবার সাধ্য থাকে না, কেবলই মুগ্ধনেত্রে ইহা দেখিবার সাধ যায়। প্রকৃতি যেন সেখানে বার মাসে তের পার্ব্বণের উৎসব করিতে থাকে। দেশে প্রবাদ এই যে বাগচী মহাশয়দিগের আগমনে ও কুলমর্য্যাদায় বড়ালের আড়াই বাঁক গঙ্গা হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম তথাপি শ্বশুর মহাশয়রা সেখানে বংশ গৌরবে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আমার শ্বশ্রূদেবীও "বোঁথড়ের" চৌধুরী কন্যা, ধনপদ মান বংশ সর্ব্বাংশে তিনিও অতীব মাননীয়া। বিবাহান্তে প্রথম যখন আমি শ্বশুরালয় যাই আমার সঙ্গে দাসদাসীর এক রেজিমেণ্ট গিয়াছিল, তাহাতে শ্বশ্রূমাতা রুষ্ট ও অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,

"বৌএর নাই রবের ঠাঁই
বৌএর সাথে ষোল'শ দাই।"

"কাটা কাপড়" পরা (সমিজ, জ্যাকেট) লেখা পড়া জানা (জানা কিছুই নহে) নব বধূর আগমন বার্ত্তা গ্রামময় প্রচার হইবামাত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সময় অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। আমি একটা দর্শনীয় পদার্থ হইয়া উঠিলাম। অনেকে আবার কৌতুহল বশতঃ আমার পড়া শুনিতে চাহিলে ভদ্রতার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ও দুর্ভাগ্যবশতঃ খেলনার সঙ্গে একটা কন্‌সার্টিনা বাদ্য ছিল তাহাও বাজাইয়া শুনাইতাম। এসব যে কোনরূপ দোষাবহ ও লজ্জাহীনতা তখন বুঝিতে পারিতাম না এবং প্রবাসে প্রবাসে থাকার জন্য উচিত প্রকার অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিতে অসমর্থা, কাজে কাজেই "মেম বৌ" পল্লী মধ্যে প্রচারিত হইয়া আমার ত্রুটির নিমিত্ত পিতা মাতার শিক্ষার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হইতে লাগিল। মনে যাহাই হউক প্রকাশ্যে শাশুড়ী মাতা সমালোচকদিগের বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সকলকে থামাইয়া দিলেন ও আমাকে গোপনে ঐ সব করিতে বারণ করিলেন। তাহার পর লোকজন সমাগত দেখিলেই গৃহের ভিতর লুকাইয়া রহিতাম, ঠাকুরাণী হাত ধরিয়া বাহিরে না আনিলে কখন কাহারো সম্মুখে আসিতাম না, কথা ত একেবারেই বন্ধ। পল্লীগ্রামের পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ভাসুর ও মামা শ্বশুরই সর্ব্বপেক্ষা গুরুতর মান্য ব্যক্তি, শ্বশুর পিতৃতুল্য, এই দুইজনকেই অত্যন্ত মানিয়া চলিতে হয়, তাঁহাদের ছায়া দর্শনও পাপজনক।

বংশানুক্রমে শ্বশুরমহাশয়দিগের লাখরাজ ব্রহ্মোত্তরে বাস। "ঠাকুরাণী" অল্প বয়সে কয়েকটী পুত্র কন্যা লইয়া বিধবা, সেই হইতে তিনিই গৃহের একমাত্র কর্ত্রী ছিলেন ও আজীবন ব্রতাচার ও ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালনে কৃশাঙ্গিনী এবং

দিবসের অধিকাংশ সময়ই পূজা আহ্নিকে অতিবাহিত হইত। ক্ষেত্রজাত ধান্যই তাঁহার ধনরত্ন স্বরূপ ছিল ও অগ্রহায়ণ পৌষে যখন সুপক্ক ধান্যে তাঁহার প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইত তিনি রাত্রি জাগিয়া স্বহস্তে সেই সব ধান্য সিদ্ধ করিয়া দেব-দুর্লভ তণ্ডুল প্রস্তুত করিতেন। তাহাতে সম্বৎসর সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও অকাতরে অতিথি সেবা চলিত। কত অনাথ দরিদ্র ছাত্রকে গৃহে আশ্রয় দিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন ও পাঠের ব্যয় ভার বহন করিতে সতত অগ্রসর থাকিতেন। দু'চারিটী "ভিক্ষা পুত্র" (উপনয়নের সময় অগ্রে ব্রত ভিক্ষা দিয়া পুত্র লাভ) গৃহে থাকিতই। তাহাদের কার্য্য, পাঠাভ্যাসের পরে তাঁহার আরাধ্য দেবতার পূজা করা। লক্ষ তুলসীপত্র শালগ্রামের মস্তকে দিবার মন্ত্র তিনি বলিয়া দিতেন, বালকগণ তাহা মুখস্থ করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পূজা করিত। শুনিয়াছিলাম কোন একজন ছাত্র প্রকৃত মন্ত্র না জানায় শালগ্রামের ভোগের সময় বলিয়াছিল, "My dear Shalgram, acccpt this vegetable kingdom and oblige." সেইজন্য তিনি দেবারাধনাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। খাঁটি সোণা যেমন পোড়াইলে আরো উজ্জল হয়, তেমনি জীবনের দুর্দ্দিনে শ্বশ্রু-মাতার ধর্ম্ম পরীক্ষায় আসাধারণ মানসিক শক্তি দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র উপবীত ত্যাগ করিয়া সমাজচ্যুত হইলে তিনি অবিচলিত দৃঢ়-ভাবে স্বীয় বিশ্বাসানুসারে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্পৃষ্ট জলও কখন স্পর্শ করিতেন না। ধার্ম্মিকপুত্রও মাতার যোগ্যতর সন্তানের ন্যায় এ সকল ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিয়া গিয়াছেন।

কোন সময় "ঠাকুরাণী মাতার" লাখরাজ ব্রহ্মোত্তরে জনৈক অর্ব্বাচীন মুসলমান জমীদার কর স্থাপনের জন্য অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে প্রথমে তিনি কর্ণপাতও করেন নাই। জমীদারের গোমস্তা আসিলেই আদালতের শরণাপন্ন হইতে বলিয়া তাড়াইয়া দিতেন। ক্রমে ভগ্নমনোরথ হইয়া পক্কধান্য কাটার সময় এক দিবস বহু লোক পাইক সর্দ্দার সমভিব্যাহারে স্বয়ং "নায়েব মহাশয়" বিঘ্ন ঘটাইতে আসিয়াছিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, ক্ষেত্র হইতে কৃষকগণ কেবল আহার করিতে গৃহে আসিয়াছে, তখনি দস্যুরা পক্কধান্য সকল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়, শ্বশ্রূমাতা ইহা শ্রবণমাত্র সামান্য সংখ্যক কৃষক সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইয়া লাঠির সাহায্যে সেই জনসঙ্ঘ সীমান্ত পারে বিতাড়িত করিয়া চিরতরে নিরাপদ হইয়াছিলেন। সেই ধনগর্ব্বিত জমীদার আর কখনও সে পথে পদার্পণ করে নাই। "ঠাকুরাণীর" সেই অসীম সাহসের খ্যাতি এক্ষণেও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত।

সেই বিবাদের পর হইতে গৃহ প্রাচীরে দুইটী পুত্তলিকা গড়াইয়া প্রত্যহ পূজান্তে শত্রুর গালে চুণকালি ও মিত্রের মুখে পুষ্প চন্দন দিতেন। একটা মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও অন্যটী গোময়ে গঠিত ছিল। প্রভাতকালে গাত্রোত্থান করিয়া

গৃহ দেবতা দর্শনান্তর গরিব প্রতিবাসীর কাহার কি অভাব ঘরে ঘরে জানিয়া তাহাদিগের আহারীয় সাধ্যমতন দিয়া আসিতেন এবং তাহারাও অনুগত ভৃত্যসম তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইত। সেই কারণে ক্ষুদ্র প্রজামণ্ডলীর শুভাশুভ ও শোক দুঃখের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সহানুভূতি থাকায় এক অর্দ্ধবয়সী ব্যক্তির ইহলোকের সুবিধা এবং পরলোকের জলপিণ্ড প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহাভ্যন্তরে তরুণী বৃদ্ধে কিরূপ বাক্যালাপ হইত তাহা অবগত নহি, তবে বাহিরের সম্ভাষণটা অতি কৌতুকাবহ ছিল। সরকারজী প্রাতে দুগ্ধ চিড়া ভক্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে যাইত এবং গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নব বধূকে উচ্চৈস্বরে "ও বাড়ী, বাড়ী আছ" বলিয়া ডাকিয়া পাড়া তোলপাড় করিত। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সম্ভাষণ শুনিবার নিমিত্ত ছোট ছোট বালক বালিকারা পথে দাঁড়াইয়া "ও বাড়ী বাড়ী আছর" প্রতিধ্বনি করিতে থাকিত। আমরাও যে কয়জন বালিকা বধূ গৃহে ছিলাম হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতাম, ঠাকুরাণীও হাসিয়া বলিতেন চৈতন্যের কোন বুদ্ধি নাই, বৌটাকে লোকসমাজে কেমন লজ্জা দেয়। "ও বাড়ী, বাড়ী আছ" অন্যের মুখে পরিহাস-চ্ছলে শুনিবার ভয়ে সরকার জায়া কোন প্রতিবাসীর বাড়ী কখন বেড়াইতে যাইত না, কেবল তাঁহার নিকট নির্ভয়ে আসিয়া বসিয়া থাকিত।

জীবনে তিনবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে কোন অনিবার্য্য কারণে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সঙ্গে আমাকেও বিক্রমপুর যাইতে হইয়াছিল। একজন পুরাতন দাসী আমার সহিত ছিল, সেই আমার পিত্রালয়ের বন্ধু, আর সবই মানিয়া চলিবার সম্পর্ক। এ প্রবাস যাত্রা আমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। "সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুর" ঐতিহাসিক স্থান, রাজা রাজবল্লভের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও অন্যান্য দৃশ্য সব এক্ষণে বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সুখে যাহা দেখা যায় তাহাই স্মরণ থাকে, উপর উপর দেখিয়া শুনিয়া শৈশব স্মৃতি বহু দিন জাগ্রত রাখা বড় কঠিন।

আমরা যে গ্রামে গিয়া উঠিয়াছিলাম তাহার নাম "কোমরপুর"। বৈদ্য শ্রেষ্ঠ স্থান, রাবণরাজা কবিরাজ পুত্র রামরাজা কবিরাজ মহাশয় যত দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিতেন ক্ষয়কাশ ও উন্মাদ রোগই তাহার মধ্যে প্রধান। কত দেশ দেশান্তর হইতে রোগী আসিয়া তাঁহার গৃহে, গ্রামে কি দূরে নৌকায় থাকিয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেন। দাতব্য ঔষধ, রোগী আরোগ্য হইলে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতে হইত। গরিব দুঃখীর নিকট তিনি অর্থ গ্রহণ করিতেন না। অমনি দেখিতেন। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণে রাত্রি দিন "পাক তৈল" "মধ্যমনারায়ণ তৈল" নানাবিধ ঘৃত ও "রসায়ণ" পাক ও প্রস্তুত হইত। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত রোগীতে বাড়ী পূর্ণ থাকিত; তিনি অক্লান্তভাবে তাহাদিগকে দেখিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা এবং ঔষধ বিতরণ করিতেন। সাধারণ

অনেক উন্মাদগ্রস্ত রোগী তাঁহার গৃহে থাকিবার স্থান পাইত ও তিনি স্বয়ং ঔষধ পথ্য সেবন করাইয়া দিতেন, তাহাতে কেহ কেহ একেবারে আরোগ্য লাভ করিত। আমরাও গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম। তাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—অতি সরল প্রকৃতি ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। গণ্ডগ্রাম, শ্রীছাঁদ কিছু ছিল না। দৃশ্য কোনদিকেই মনোজ্ঞ নহে, বেতবনে চতুর্দ্দিক আবৃত এবং আসন্ন মৃত্যু রোগীর বাসে যেন সব নিরানন্দ আকার ধারণ করিয়াছিল। গ্রামে নদী নাই, ছোট ছোট পুষ্করিণীর জলে ও কূপোদকে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ এবং অন্তিম ক্রিয়াও সমাধা করিতে হইত। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পশ্চাতে নিজ নিজ শ্মশান। শবদাহের দৃশ্য দেখিয়া আগন্তুকের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় এবং বিষাদ সঞ্চার হয়। এই অভাবনীয় দৃশ্যে আমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সেই যে কষ্টকর হাঁপানী রোগাক্রান্ত হইয়াছি এ পর্য্যন্ত তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যদিও বিবাহ সম্পর্কে ঢাকা, ময়মনসিং, বিক্রমপুর প্রভৃতি কুটুম্ব স্থান তথাপি কতক কতক আচার ব্যবহার আমাদিগের দেশের সহিত সম্পূর্ণ পৃথক। ভোজ্য ফলাহার সব অন্য প্রকার। একটী ভোজের আয়োজনে সমগ্র দেশের লঙ্কা, "মরীচ" আনীত হইয়া এক একটা ব্যঞ্জন লোহিত বর্ণে রন্ধনশালা আলো করিতে থাকে। শোণনদের আবির্ভাবে সকল লালে লাল হইয়া যায়। জনশ্রুতি তাহাতে বিদাহী শক্তি না থাকায় ভোজনে অতীব উপাদেয়। পূর্ব্ব বঙ্গের পল্লী-গ্রামে আহারীয় দ্রব্যাদি সেকালে বড় দুর্মূল্য ছিল, রীতিমত বাজার বসিত না, সপ্তাহে একবার মাত্র হাট লাগিত, সেইদিন সমস্ত ক্রয় করিয়া রাখিতে হইত, বৃহৎ মৎস্য ত পাওয়াই সুকঠিন। এ অনেক কালের কথা, এক্ষণে দেশকাল ভেদে রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইয়া আবার নবীনভাবে সব দেখা দিয়া থাকিবে।

"একাদশীতে" নির্জ্জলা উপবাস করা ও অঞ্চলে নাই। বাল্য-বিধবা কিম্বা অক্ষম বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরা "খৈ দই" খাইয়া একাদশী পালন করেন। আমাদিগের রাজসাহী জেলায় মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও তৃষ্ণাকাতর বিধবা নারীগণ একাদশী দিনে গঙ্গা জলও পান করেন না। এমন কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে কুত্রাপি দেখি নাই। কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগের বৈধব্য প্রথার কোনরূপ শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই পূর্ব্ববৎ ত্রিবেণী তটে উদয়াস্ত দুরন্ত শীতে মাঘে কল্প বাস, চতুর্মাস্যায় এক সিক্ত বস্ত্রে থাকিয়া কাঁচা দুগ্ধমাত্র পান এবং অধিকাংশ তিথিতে অনশনে থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া জন্মান্তরে আর বৈধব্য সংঘটন না হয় তাহাই কায়মনোবাক্যে কামনা করেন।

দুর্ভাগ্য যে একা আইসে না এবাক্য অতি সত্য। বিক্রমপুর হইতে নিষ্ফল ফিরিয়া পিত্রালয় আসিবার দিন কতক মধ্যে আমার বিবাহের দানের ও

যৌতুকের বহুমূল্য সমুদায় বস্ত্রালঙ্কার চোরে লইয়া যায়। বহু পুরাতন ভৃত্যপুত্র ও অপরিজ্ঞাত এক ব্রাহ্মণ তনয় আমাদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। আমাদিগের হরিপুরের বাড়ী চোর ডাকাতের প্রবেশ পথ নাই, নদীর ঘাট হইতে গ্রামে যাইবার দুইপার্শ্বে "মেটে" জাতি শীকারিগণের বাস, তাহারা প্রহরীরূপে জমীদারের গৃহরক্ষা করে। তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া গ্রামে ডাকাতি করা অসম্ভব। বংশপরম্পরায় দেশের সমস্ত জনপদের সঙ্গে পরিচিত থাকায় কাহার এমন সাহস যে "চৌধুরী বাড়ী" চুরি ডাকাতি করিবে? বহুকাল পূর্ব্বে—যুগ যুগান্তরের কথা,—একবার নাকি ছোটবাড়ীর "দেড়ে কালীকান্ত" * শত্রুতা করিয়া গভীর রাত্রে লোকজনসহ ডাকাতি করিতে আমাদিগের তোষাখানায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে পিতৃদেবের পিসিমাতা শয়ন করিতেন। তিনি গোলমাল শুনিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন ডাকাত সাজে দেড়ে কালীকান্ত। তিনি রাগে চীৎকার স্বরে বলিয়া উঠিলেন "তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমাদের বাড়ী ডাকাতি করিতে আসিয়াছিস? আমি বাঁচিয়া থাকিতে এ বাড়ীর কিছু লইতে পারিবি না, এখনি তোকে জব্দ করিব।" বলিতে বলিতে নির্ভয়ে বাহির হইয়া পাইক সর্দ্দার ডাকিয়া সব ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অসম সাহসের ও অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধ গৃহে ডাকাতেরা বন্দুক আওয়াজ করিয়া তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত বধির করিয়া দিয়াছিল। সে অতীত যুগের ঈর্ষান্বিত শত্রুর প্রতিহিংসা বা ডাকাতির পরে প্রথম আমার অলঙ্কার চুরি যাওয়া। থানা পুলিশ স্বয়ং জমীদারের আমলারাই, কোথাও কিছু সংবাদ না দিয়া চোরদিগকে অতি প্রহারে চুরি স্বীকার করাইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ অবস্থায় সদরে চালান দিলেন। কাছারীতে সেই সকল প্রকাশ হইয়া তাহারা নিষ্কৃতি লাভ করিল, অনেক অর্থব্যয়ে আমলাবর্গ শ্রীঘর দর্শন করিলেন না মাত্র। দোষীর মুক্তি সমাচারে গ্রামের লোকে একত্র হইয়া চোরদিগের শাসনের জন্য ধর্ম্মঘট করিলেন এবং তাহাদিগের অপরাধের দণ্ড বিধান এক ঘরে করা স্থির হইয়া গেল। তাহারাও পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

* কলির ভীমরূপী "ছোটবাড়ীর কালীকান্ত" চৌধুরী গোষ্ঠীরই একজন, তাঁহার আবক্ষ লম্বমান ঘনাবৃত শ্মশ্রু থাকায় তিনি ঐ নামে পরিচিত। বলিদানের উষ্ণ ছাগশোণিত শোষণ করিয়া পান করিতেন, একটা প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য, বহুবিধ ব্যঞ্জন এবং রাশীকৃত অন্নে তাঁহার জঠরানল নির্ব্বাপিত হইত না। চেহারা যেন জলদস্যু, অজন্মার বৎসরে মহাজনের ধান্য লুঠ ও তাহা অনাথ দরিদ্র মধ্যে বিতরণ করিতেন। অন্য দিকে আবার কাহারো সহিত কলহ হইলে তাহার আর ইহলোকে নিস্তার ছিল না। মিত্রের জন্য হাস্যমুখে সর্ব্বস্ব দিয়া দিতেন, গ্রামের গরীব দুঃখী কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে ও মৃতের সৎকারে সতত অগ্রসর ছিলেন। দোষে গুণে এমন একব্যক্তি আজ কালের দিনে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ভয়ে পাড়া যেমন কম্পমান থাকিত, তেমনি আবার দুঃখীর ক্রন্দন শ্রবণে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যাইতেন। কি দিয়া যে তাহার অভাব মোচন করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনই তাঁহার রাজধর্ম্ম ছিল।

পূর্ব্বে কথায় কথায় আদালতের আশ্রয় ভিক্ষা করা অপমানজনক ছিল, জমীদারগণ নিজ নিজ কাছারীতে রীতিমত বিচারাসনে বসিয়া অপরাধের সমুচিত শাস্তি দিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড "একঘরে" করা। কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন, পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ বন্ধ, গ্রামে কাহারো নিমন্ত্রণ নাই, গুরু পুরোহিত ধোপা নাপিত দাস দাসী, এবং ভূঁইমালী পর্য্যন্ত এককালীন রহিত। পথে ঘাটে বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। বাজার হাট যাইতে হইলে সাধারণ লোকের বালকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছড়া গাহিতে গাহিতে হাততালি দিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকে। সে সব গ্রাম্য ছড়াও অদ্ভুত, যেমন "চোরের বাপের ডাগর গলা, আরো চায় পাকা কলা।" "এত রঙ্গ দেখালি ভবানন্দের মা, পিঠে যে ভাজ্‌লি তার হাত পা।" "আগুনো পোহাই কাপড়ো সেঁকি, যে যা করে তাও দেখি।"

সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গতি "একঘরে" ব্যক্তির গৃহে মৃত্যু সংঘটন হইলে সৎকার করিবার লোক ও দাহের কাষ্ঠ পাওয়া যায় না! কাহারো কোন সহানুভূতি নাই, বাসিমরা হইবার ভয়ে প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ আপন স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়, জনপ্রাণী সাহায্য করে না। এ শাস্তি ফাঁসির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। বৃটিশ সিংহের ঘোরতর ভীষণ গর্জ্জন, কোর্ত্তা কুর্ত্তী পরিহিত, শ্বেতকৃষ্ণ গুম্ফধারী পাহারাওয়ালার যমদণ্ড প্রহার ও প্রাচীর বেষ্টিত অন্ধকূপে আবদ্ধ প্রভৃতি শাসনেও যাহা প্রতীকার না হয় এ সামাজিক শাসন দণ্ড তদপেক্ষা স্থায়ী ফলদায়ক। মনুষ্যজাতি সমাজচ্যুত হইয়া কখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

নানারূপ পারিবারিক বিপদ আপদের জন্য অনেক দিন আমার শ্বশুরালয়ে যাওয়া ঘটে নাই, তখন আমরা যশোহরে থাকিতাম। আদান প্রদান তত্ত্বাবধান পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিত, শীতে গুড় নারিকেল নূতন চাউল পীঠের সরঞ্জাম, বৈশাখে ফল মিষ্টান্ন ও শারদীয় পূজার সময় নব বস্ত্র ও সেই সঙ্গে পার্ব্বণী সমানভাবে দিয়া তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা ও মনস্তুষ্টি করিতে হইত। আমার পিতৃস্বসারাই দেশে থাকিয়া সে সকল নিয়ম রক্ষা করিতেন।

প্রিয়র জন্ম পরে আর একবার আমি কন্যাসহ শ্বশুরালয় গিয়াছিলাম, সেই শেষ। শ্বশ্রূমাতা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নাম রাখিয়াছিলেন "গিরিবালা"। জানিনা কেন তাঁহার দত্ত "গিরিবালা" লুপ্ত হইয়া প্রিয়ম্বদা বজায় রহিয়া গেল। যদিও সে গ্রামের লোক তাহাকে ঐ নামেই ডাকিতেন এবং কত স্নেহ আদরে বিবিধ খেলনা ফল সর্ব্বদা আনিয়া দিয়া যাইতেন ও ক্ষুদ্র "গিরি" তাঁহাদিগের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া সেখান হইতে পুনর্ব্বার মাতামহালয়ে ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, তবুও আমরা আবার যথাকালে পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলাম। এ যাত্রায় আমি পূর্ণ মাত্রায় লজ্জাশীলা কুলবধূ ও ছোটখাট গৃহিণী। কেহ কোন ত্রুটি ধরিতে পারিত না, "ঠাকুরাণী" তখন সর্ব্বসম্মুখেই আমার প্রতি

অত্যধিক স্নেহ দেখাইয়া অন্য বধূগণের অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার ও আমার জীবনের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝাবাত্যা বহিয়া গেল, তিনি ভগ্ন হৃদয়ে রোগ শোকে ভুগিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন, আমিই পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। তাঁহার "গিরিবালাকে" মৃত্যুকালে তিনি অশেষ প্রকার শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া যান। আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তাহার একটীও ফলপ্রদ হয় নাই। প্রিয়জন মৃত্যু শোকে জীবনের সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম শ্বশুর কুলে ব্রহ্মশাপ থাকায় কন্যাগণ সকলেই প্রায় নিঃসন্তান বিধবা এবং পুত্রদিগেরও বংশের উন্নতি নাই, জন্ম মৃত্যু লইয়া কোনরূপে তাঁহারা জীবিত আছেন এইমাত্র। তাঁহাদিগের মাতুল বংশ এককালীন লোপ পাইয়াছে। কালের বিচিত্র গতিই এ প্রকার।

আশু যোগেশের অন্নপ্রাশন যেমন একত্র হইয়াছিল তেমনি তাহাদিগের উপনয়নও একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। ছোট ভাই দুইটী এক পালকী চড়িয়া পুরাতন চাকর সহ হরিপুর যাইয়া পৌছিলে সেখানে উৎসবের স্রোত বহিয়া গেল, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। জ্যাঠামহাশয় স্বয়ং আশুর গলায় যজ্ঞোপবীত ও কানে গায়ত্রী মন্ত্র দিলেন। আর অন্য একজন জ্ঞাতি যোগেশের দীক্ষা গুরু হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত আশুকে ব্রত ভিক্ষা স্বরূপ কয়েকখানি লাভজনক গ্রাম দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু পিতৃঠাকুর তাহা লইতে দেন নাই। তাঁহার দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল ভাবীকালে পুত্র কৃতী হইয়া বংশগৌরব রক্ষা করিবে। উপনয়নের ভিক্ষায় পঞ্চখানি গ্রাম লইয়া পরে জ্যেষ্ঠতাত পুত্রের সহিত মনোমালিন্য ঘটিতে পারে সেটা ইচ্ছনীয় নহে। ভূমি দানের নিয়ম, গঙ্গামৃত্তিক মন্ত্রপূত করিয়া নবীন ব্রহ্মচারীর হস্তে দেওয়া, তাহাতে রীতিমতন লেখাপড়া না থাকিলেও কিছু আইসে যায় না এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে স্বত্ব রহিয়া যায়। মাঘ মাসের শীতে ব্রহ্মচারীবেশী ক্ষুদ্র দুটী বালক প্রাতঃস্নানান্তে যখন বেদপাঠ শিক্ষা করিত, তখন তাহাদিগের সেই শান্তিপূর্ণ দিব্য মুখকান্তি ও সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগতপ্রাণা পিসিমাতারা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। উপবীত ধারণের পূর্ব্বে যদি অসময়ে মেঘ-গর্জ্জন হয় তাহাতে উপনয়ন অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রাতাগণের যজ্ঞোপবীতের দিনে হঠাৎ ঘন মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাতে সব আবার তিনদিন পর নূতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। বর্ষার জল ঝড় ও মেঘের ডাকে কোন ক্ষতি নাই, অকালে তাহা হইলেই গোল। এই কারণে আশুর উপনয়নও অন্নপ্রাশনের ন্যায় দুইবার হয়।

উপনয়নের এক বৎসর আশুরা পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মচারী থাকিয়া কাহারো অন্নজল ও অখাদ্য স্পর্শ করিত না। রীতিমত একাদশী পালন ও মৌনভাবে বসিয়া আহার করিত। বাড়ী হইতে যশোহর প্রত্যাবর্ত্তন কালে রন্ধনের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইবার আগেই আমাদের পাল্কী স্কন্ধে বাহকগণ

গ্রাম্য তান লয়ে গীত গাহিতে গাহিতে চলিতে আরম্ভ করিলে আমরাও ঊষার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শনে ও বিহঙ্গের সঙ্গীতে জাগিয়া উঠিতাম। কত গ্রাম কত প্রশান্ত মাঠ ঘাট অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহর বেলায় কোন এক নদীতীরে ছায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়া স্নানাহারের আয়োজন হইত। ব্যবস্থা সব ভৃত্য ঈশ্বর দাস করিয়া দিত, আমি উপলক্ষ মাত্র। ভ্রাতারা স্নাত দেহে গরদ পরিয়া আহারে বসিয়া যাইত ও শিবের নন্দীরূপী ঈশ্বর দাস দূরে দাঁড়াইয়া অন্য জাতির গমনাগমন বন্ধ জন্য পাহারা দিত। তাহার ত্রিসীমায় কাহারো ছায়াপাত হইবার হুকুম ছিল না, এমনি কড়া প্রহরী। তিন দিবস পথের মুক্ত বায়ুতে রহিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে ভ্রাতাগণ সহকারে যৎকালে আমরা যশোহর পৌছিলাম, আমাদিগকে দেখিয়া পিতা মাতার এবং অন্য পরিজনবর্গের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসাধ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজত্ব লাভেও এমন পূর্ণ সুখ তাঁহাদিগের নিকট স্পৃহনীয় ছিল না। তখনকার সে সব উৎসব আনন্দের কথাবার্ত্তা এখন যেন স্বপ্নের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। পরমারাধ্য জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃষসাগণ এবং পিতৃদেব কেহই আর ইহলোকে নাই, কেবল তাঁহাদিগের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগের নিত্য সম্বল। যদিও আজকাল বিদ্যালয়ে পরকীয় ভাষায় বিদেশীয় বংশাবলী মুখস্থ করা নিয়ম, তথাপি প্রত্যেক গৃহের মাতা কিম্বা পিতামহীরা অতীত কালের সমস্ত বিষয় ও পারিবারিক বংশাবলী বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দেন ও ঐ সকল প্রত্যহ আলোচনা করেন, তাহাতে ভাবী বংশধরগণের দেশানুরাগ এবং পারিবারিক জীবনের ভক্তি প্রীতির বন্ধন আরো বাড়িয়া যায়। আধুনিক অনেক যুবক যুবতীরা পিতা ভিন্ন অন্য পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষের নাম বলিতে পারেন না। যিনি পিতামহের নামটা জানেন তিনি বড় "স্বদেশী"! নেলসানের ঊর্দ্ধ অথবা চতুর্দ্দশ গোষ্ঠীর ইতিহাস শিখিয়া শুধু বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে ও ভবিষ্যতে "ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্টঃ ন পূর্ব্বং ন পরং" হইয়া থাকে।

বর্ষার প্রারম্ভে যশোহর জেলার চতুর্দ্দিকে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত। আমরাও যখন ছিলাম তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাই নাই। সে সময় জ্বরের প্রথম দিন নিরম্বু উপবাস, দ্বিতীয় দিনে "পঞ্চকোল"* পাঁচন, তৃতীয় দিবসে খৈ মিছরী, চতুর্থ দিনে মুগ মসুরের যুশ, পঞ্চম দিনে "কাঠ খোলায়" অর্থাৎ বালুকা দ্বারা নহে, চিড়া ভাজা ও বাতাসা পথ্য। এই প্রকার শুকাইয়া শুকাইয়া অষ্টাহ পরে "চালে ডালে"** কিম্বা অতি পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য পাওয়া যাইত। শীতল জল পান নিষিদ্ধ ছিল। এখনকার মত বরফ,

* পঞ্চকোল পাঁচন বিশেষ, "বচ পিপুল চই আদার সুঁট ও ক্ষেত্র পাঁপড়ি" এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে সন্ধব লবণ সহ উষ্ণ উষ্ণ সেবন করা বিধি।

** "ডালে চালে," এক তোলা অতি পুরাতন চাল ও এক তোলা মুগের ডাল চৌদ্দ খুরী জলে তেজপত্র ও লবণ সংযোগে রন্ধন করিয়া পথ্য দেওয়া নিয়ম ছিল।

লেমনেড, সোডা প্রভৃতি রোগীরা চক্ষেও কখন দেখেন নাই। বৈদ্যরাজ ঔষধের পুঁটুলী উত্তরীয়ে বাঁধিয়া পদব্রজে আসিতেন, রোগীর নাড়ী ধরিয়া বায়ু পিত্ত কফের প্রকোপ নির্ণয়ান্তর ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইতেন, সপ্তাহের দর্শনী (Fees) দুইটি মাত্র রজত মুদ্রা।

সরকারী কার্য্যে পিতৃ ঠাকুরকে একস্থানে স্থির হইতে দেয় নাই। আবার যশোহর হইতে কৃষ্ণনগর বদলী আজ্ঞা আসিল, এবার শাপে বর হইল। আমরা নূতন সহর দেখিব আশায় আনন্দিত, পিতা মাতা পুত্র দেবেন্দ্র হারা যশোহর ত্যাগে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। "অন্নদা মঙ্গলের" কবিগুণাকরের ধরণীঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী প্রাচীন কৃষ্ণনগর, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ এবং অদ্বৈত গোস্বামীর শান্তিপুর তখনি মানস নেত্রে প্রতিভাত হইয়া অতীত গৌরব স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। গ্রন্থ পাঠে জানা আর চক্ষে দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ স্বতন্ত্র। শীত ঋতুর অবসানে যেমন বসন্ত, তেমনি কৈশোরান্তে যৌবন সমাগমে মনুষ্য হৃদয়ে নানাবিধ ভাবোদয়, প্রকৃতি রাজ্যে যাহা আছে কিম্বা নাই তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া এককে শত গুণে বাড়াইয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায়। এ কৃষ্ণনগর গমনও আমার পক্ষে সেই প্রকার নব উপন্যাসের প্রথম প্রেম কাহিনীর ন্যায় মোহময় হইয়াছিল।

সে সময় রেলপথ ছিল না, অশ্বযানে যাইতে হইত, আমরাও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া পথিমধ্যে কুমুদের জন্মস্থান ও আমাদের শৈশব সুখ স্মৃতির বনগ্রামে শ্রদ্ধাস্পদ ৺শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে যাইয়া উপনীত হইলাম। বিপত্নীক গৃহস্বামী আমাদিগের সুবিধার জন্য সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইলেন। তাঁহার পিতৃবৎ স্নেহ, মমতা, আদর, আপ্যায়ন সমভাবে পাইয়াও গৃহলক্ষ্মীর অভাবটা বড় মনে হইত। মা দুদিনে সেই শূন্য ভবন মাতৃত্বে পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্ব দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন। সে দুদিনের আনন্দ উৎসব ভ্রাতাগণের ক্রীড়া হাস্য অন্ধকার নিরানন্দ জীবনের নিত্য স্মরণীয়। যাহা ছিল তাহা নাই বলিয়া কাঁদিতে পারি তথাপি স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাহি না।

"It is better to have loved and lost than never to have loved at all."

কৃষ্ণনগর প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের খ্রীষ্টান নাম রটিয়া চাকর দাসী ও পাচক ব্রাহ্মণ পাওয়ার বড় গোল হয়। এ অনর্থের মূল ধর্ম্ম না, আমাদের পায়ের উপানৎ। একে নবাগত, তাহাতে কতক বিদেশী চাল চলন, কাজেই আরম্ভটা তেমন সুবিধাজনক বোধ হয় নাই। ক্রমশঃ আলাপ পরিচয়ে সর্ব্ব অসুবিধা তিরোহিত হইয়া যায়। যাইবার দিনই সনন্দ হস্তে যাচক উপযাচকের দল, কার্য্যপ্রার্থী, একে একে, দু'য়ে দু'য়ে, আসিয়া যাহার যা অভিলাষ ও বাঞ্ছা জানাইতে লাগিল, তাহাদিগের মধ্যে নূতন দেখিলাম ডাক্তার বাবু বাহক স্কন্ধে

ও নবদ্বীপে অন্তিম যাত্রা করাইবার জন্ত জল্লাদরূপী "মুর্দ্দাফরাস"। চিকিৎসক এবং তাহার পরেই শববাহক, ইহাতে ধন্বন্তরীর হাতযশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাঁহার রোগীর শেষ গতি জাহ্নবী তীর।

"ধরণীঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের" রাজধানী কৃষ্ণনগর দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট খাট সহর। প্রকৃতির শ্যামল তরু লতায় ও বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ বৃক্ষে রাজপথ ছায়াময়। "কোম্পানীর বাগান" আম্র কানন শোভার সদন, সেখানে দিবা দ্বিপ্রহরে কি সায়াহ্নের গোধূলি রাগ রঞ্জিত আকাশতলে উপবেশন বা শয়ন করিয়া কল্পনার স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্য জীবনের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ একাকার হইয়া যায় ও অন্তরে গভীর শান্তি আনয়ন করে। এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ ভাব এমন ললিত বিহঙ্গ গীতি, এমন স্বভাবের মুক্ত সৌন্দর্য্য আমরণ ভোগের জন্ত বিধাতাই যেন ধরাতলে অভিনব মায়ারাজ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর আসিয়া আমাদিগের ভাগ্যে যথার্থ বন্ধুলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় জীবনকে সর্ব্ববিষয়ে কেমন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। পিতৃসুহৃদ পুজ্যতম দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী ও ঋষি-প্রতিম রামতনু বাবু আদর্শ চরিত্রবান মহাপুরুষ। দেওয়ানজী মহাশয় একদিকে যেমন কাব্যানুরাগী ও সুগায়ক অন্তদিকে আবার তেমনি রাজদরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিতেন। তাঁহার সব সুন্দর ছিল, তাঁহার গৃহ, পুষ্পোদ্যান আম্রকানন ও লতাকুঞ্জ একটী দর্শনীয় বস্তু। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া প্রথমেই তাঁহার সহাস্য প্রীতিপূর্ণ মুখ দেখিয়া দিনটা সার্থক হইয়া যাইত। তাঁহার অন্ত সব পুত্রগণের সৌজন্ত এবং সুকণ্ঠ "কুমার যুগল" "হরু" (শ্রীমান হরেন্দ্রলাল রায়) "দ্বিজুর" (শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)* মধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহাদিগের সরলা স্নেহময়ী জননীর অজস্র স্নেহের প্রিয়বাক্য, সেই সঙ্গে অকৃত্রিম আতিথ্য ইহ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের সাত ভ্রাতার একমাত্র ভগিনী, সুন্দরী সুশীলা মালতী পিতৃগৃহ আলো করিয়া থাকিত। তাহার সেই বাল্যের ধূলিখেলা, কৈশোর সমাগমে সুখ পরিণয় ও যৌবনের মহাযাত্রা এই তিন অঙ্কই চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মালতী পিত্রালয়ের শ্রী সৌষ্ঠব বিলুপ্ত প্রায় করিয়াছে, দেওয়ানজী মহাশয়ের লোকান্তর গমনের সহিত তাঁহার সাধের পুষ্প-বীথিকায় তেমন বসোরা গোলাপ আর প্রস্ফুটিত হয় না, পল্লবিত দেবদারু বৃক্ষের শাখায় প্রচ্ছন্ন বসিয়া কোকিল দয়েল পাপিয়া ও বৌ কথাকও ললিত ভৈরবী গাহিয়া চিত্ত মুগ্ধ করে না। তাঁহার স্বহস্ত রোপিত আম্রবৃক্ষে তেমন উপাদেয় মধুফল আর যেন ফলে না। আছে সবই, কিন্তু তাঁহার অভাবে কিছুই

---

* দ্বিজুর জীবিতকালে তাহার বিষয় লিখিয়াছিলাম। অদ্য তাহা শোকের গভীর চিহ্নস্বরূপ হইয়াছে। তিনি একদিন ইহা শুনিতে আসিবেন কথাও ছিল, কিন্তু অসময়ে অকালে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ও আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, এই আরো গভীর দুঃখ।

আর তেমনটী নাই।

"কর্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান্,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।"

"সুরধুনী কাব্যের" ভাগীরথী পতিতপাবনী হইয়াও তাঁহার গীত শুনিবার জন্য আবার "উজান বাহিনী" হইতে চাহিয়াছিলেন। আমরা ত দুর্ব্বল মনুষ্য, তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখের সেই অমর সঙ্গীত কিরূপে বিস্মৃত হইব ? যিনি একবার মাত্র সে সুধাগীতি শ্রবণ করিয়াছেন তিনি ইহজন্মে তাহা কখন আর ভুলিতে পারিবেন না। এই কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠপুত্র, শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ভ্রাতাগণের সহপাঠী শৈশব সহচর এবং অন্তকার বন্ধু। "দ্বিজু" এক্ষণে কবি, নাট্যকার, ব্যঙ্গরসিক, হাসির গান রচয়িতা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্ বড় লোক, তবু আমাদিগের নিকটে আজও পূর্ব্বের সেই "দ্বিজু"। তাহার বাল্য রচিত

"জানি না জননী কেন এত ভালবাসি ?
দুঃখের তাড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে
জানি না তোমার (ই) কাছে কেন ধেয়ে আসি ?"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান। তাহার পুণ্যবতী মাতৃদেবী এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া স্নেহ বিগলিত প্রাণে প্রিয়তম পুত্রের গাত্রে কল্যাণ হস্ত বুলাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সেই মাতৃ আশীর্ব্বাদের অক্ষয় ফলস্বরূপ আজিকার "আমার দেশ" ও "জন্মভূমি" জীবন্তকলেবর ধারণ করিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দান করিতেছে :

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞমত বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর "রামতনু" সকলে বিদিত।"

এই জগৎ বিখ্যাত মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা কণ্ব দুহিতা শকুন্তলারূপিণী ইন্দুমতী পিতৃদেবের তপোবনের জীবন স্বরূপা ছিলেন। সেই সলজ্জ শান্ত মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বনলতা, উদ্যানলতাকে ম্লান করিয়া আশ্রমের

শোভা সম্পাদন করিতেন। শাপভ্রষ্ট দেববালা পারিবারিক ও অশ্রান্ত ভ্রাতৃসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া অকালে দিব্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যজীবন ভোগের জন্য নহে, শুধু ত্যাগের জন্য, পরার্থপরতায় যৌবনের সমস্ত সুখাশা প্রণয় প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়া জগৎকে কেবল কর্ত্তব্যকার্য্যে উচ্চতর ভালবাসা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তাঁহার মহিমময়ী নারীজন্ম গ্রহণ। সেই ঋষিতনয়া কুমারী ইন্দুমতীর সহিত প্রথম সন্দর্শনে আমার তরুণ হৃদয়ের যেন শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে অপরিস্ফুট মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ কিছু ছিল না, বিনিময়ের মাধুরী বুঝিতাম না, ভালবাসার প্রতিদানে আবার যে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয় তাহাও জানিতাম না। আত্মার বাস্তবিক পূর্ণতা দানে, গ্রহণে নহে। পিতৃ মাতৃ স্নেহজীবিত ও ভ্রাতাগণের বাল্য বন্ধুত্ব যে জীবনের সম্বল ছিল, পরিজন মধ্যে কেন্দ্রীভূত সীমাবদ্ধ ভালবাসায় নিজের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায় এই নবীন বন্ধুর প্রতি প্রেমানুরাগের স্রোতে চিত্ত একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃতি এখন তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং দ্বিতীয় প্রহর রজনী কথায় কথায় এই দীর্ঘ সময় কোথায় দিয়া যে চলিয়া যাইত বুঝিতেও পারিতাম না। সে কোন রাজনৈতিক গুপ্ত পরামর্শ, কিম্বা বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার চেষ্টার আলোচনা নহে, ইহাতে কেবল সংসার অনভিজ্ঞ উভয় জীবনের অতৃপ্ত আশার,—নৈরাশ্য কাতরতা, কল্পনার মোহস্বপ্ন, সেই অভিনব সৃষ্ট রাজ্যের সমগ্রভাবসমূহ ও নব দৃশ্যপট সব মানসজাত, বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত। যৌবন বসন্তের সমাবেশে প্রত্যেক মনুষ্যজীবনের এইরূপ টলমল অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আশায় নৈরাশ্য, দানে প্রত্যাখ্যান, ও ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাতেই হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিণতি হইয়া আমরা সত্যকার মনুষ্য নামের যোগ্য হই।

ভগবদ্ভক্ত "রামতনু" ইহলোকে প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র আদর্শ কন্যার অকাল মৃত্যুশোক গভীর বিশ্বাস বলে পরাজয় করিয়া এক্ষণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান্ শরৎকুমার লাহিড়ী (Mr. S. K. Lahiri)* অধুনা পিতৃ বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই লাহিড়ী মহাশয়েরই সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী, একাধারে কবি এবং কবিরাজ, সুদক্ষ চিকিৎসক, তিনি পরোপকারী ও অতিশয় বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এ কবিতার প্রত্যেক বাক্য জাজ্বল্যমান সত্য।

"করিলাম তারপরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক রতন,

* শরৎ ত আর ইহলোকে নাই। "পূর্ব্বকথা" সুপ্রভাতে যখন বাহির হয় তখন তিনি জীবিত ছিলেন।

সুশীতল সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পিরীতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার।
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর ভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকশিত যাতে তাঁর হৃদয় পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয়, দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ,
কেমন স্বভাব তাঁর, মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীরক্ষীর।

(সুরধুনী কাব্য)

কৃষ্ণনগর দীর্ঘ প্রবাসের দৈনিক ইতিহাস ও প্রত্যেক বন্ধুর অকপট স্নেহ ভালবাসা এক এক করিয়া বলিতে গেলে জীবন নাট্যের দশম অঙ্কেও তাহা পরিসমাপ্ত হইবার নহে, আবার কিছু না বলিয়া নীরব থাকিলেও ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, উভয়সঙ্কট, সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

সেখানে বাসকালীন নদীয়া রাজ অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য কখন অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে মহারাজা ৺শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের দুকন্যা কালীকুমারী দেবীর সঙ্গে দৈবাৎ পরিচয় হইয়া এমন একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইয়াছিল যে তিনি আমাদিগকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ মমতা করিতেন। আমাকে "মেয়ে" সম্বোধনে কত আদর যত্ন দেখাইতেন, নাম ধরিয়া ডাকিতেন না, সেটা তাঁহার নিকট অসম্মান সূচক মনে হইত। মাতা কালী-কুমারী দেবী অতি সরলা, স্বজন বৎসলা ও অনাথ দুঃখীর মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বারে নিত্য সদাব্রত চলিত। কত কত নিরাশ্রয়া বিধবা তাঁহারই স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া নিরাপদে ধর্ম্মকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, একটী দিনের জন্য কোন রূঢ় বাক্য তাঁহার মুখে শুনিতে হয় নাই। রাজকুমারীর ধনগর্ব্ব, বৃথা বংশ মর্য্যাদার চিহ্ন ভিতর বাহিরে ছিল না, মানসিক উচ্চতায় তিনি যথার্থ রাজ্ঞীবৎ থাকিয়া বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে কুলীন ব্রাহ্মণ রাজজামাতার সর্ব্বস্ব, ধন মান বিষয় বৈভব কোথায় দিয়া যে উড়িয়াপুড়িয়া গেল তাহার তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারই

একমাত্র পুত্র লোকরঞ্জন শ্যামাধব "রায়বাবু"* বড় অমায়িক পরোপকারী ও সুরসিক ছিলেন। তাঁহার রহস্যজনক এক একটা কথায় ও গল্পে মজলিসে হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইত। কোন সময় রেলগাড়ীতে কৌতুহলাক্রান্ত এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন "নাম শ্যামাধব রায়, পিতৃনাম অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়"। তাহাতে ভদ্রলোকটী পরিতুষ্ট না হইয়া আবার বলেন "এ কিরূপ মহাশয়, মুখয্যার ছেলে, রায় ?" উত্তর, "অমন হয়ে থাকে, কি করা হয় ?" "কিছু না", "চলে কিসে ?" "চুরী ব্যবসায়।" তখন গাড়ীর মধ্যের অন্য সব ভদ্রলোক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং কৌতুহলী ভদ্র সন্তান, সতীশচন্দ্র মহারাজের ভাগিনেয় "রায়বাবু" বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। "রায়বাবু" একটী বি, এ উপাধিধারিণী মহিলার ইংরাজী বলার গর্ব্বিত ভাব ও প্রগল্‌ভতায় আমোদিত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন "অমুক খুব শিক্ষিতা ও ইংরাজী "Bosh" বস্ টস্ বলিতেছে, এই ত শিক্ষা, আপনারা কেহই তাঁহার কাছে লাগেন না।"

ইল্‌বার্ট বিলের দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় অনেক রাজা মহারাজাগণের পৃথক পৃথক মত লওয়া হয়। তখন রাজ ভাগিনেয় রায়বাবুকে ছোটলাট সদনে লইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি নিতান্ত নিরুপায় অবস্থাপন্ন ভাবে প্রকৃত মত গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন "আমি চির বোকা তাহা ত আপনি জানেন, কলেজে অতি পরিশ্রমেও এফের উপরে উঠিতে পারি নাই, আপনাদের দয়ায় এখন ডিপুটী, তবুও প্রমোশনের আশা নাই। শুধু আমারই বুদ্ধি কম তাহা নহে, মাতুল বুদ্ধিহীন, মাও তেমনি, এমন বংশের আবার মত লইয়া কি হইবে ?" তাঁহার এই কথায় ছোটলাট অতিশয় হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন "হাঁ ঠিক কথা, তুমি সুশীলা রাজকন্যা কালীকুমারীর নির্ব্বোধ ছেলে শ্যামাধব। কলেজে কখন প্রাইজ পাইতে দেখি নাই। রাজ মাতার আদুরে বোকা নাতি।" এই মাতা পুত্র উভয়েই অদ্য লোকান্তরে। তাঁহাদের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। নিঃসন্তান রায়বাবুর দুঃখিনী বিধবা জীবিত আছেন মাত্র। লোকে কথায় বলে "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, আছে কেবল হায় হায়" ; এও তেমনি আজ কাল।

এই কৃষ্ণনগরেই খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দিগের পরিবারের সঙ্গে আমাদিগের হৃদ্যতা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই আমাদের পরমাত্মীয়, ঘোষ মহাশয়দিগের মাতৃদেবী সুগৃহিণী এবং সর্ব্বাংশে আদর্শ নারী ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনা সামাজিক লোক লৌকিকতা আদান প্রদান দৈনিক যথাযোগ্যরূপে নির্ব্বাহ করিতেন, কোন কার্য্যে ত্রুটি দেখা যাইত না।

* নদীয়া রাজবংশের ভাগিনার উপাধি "রায়বাবু", তিনিও সেইজন্য সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত রায়বাবু নামেই খ্যাত ছিলেন। শ্যামাধব কেহ বলিত না।

দয়াবতী পরদুঃখকাতরা মাতা দানে মুক্তহস্ত থাকায় তাঁহার আশ্রয়ে কত দরিদ্র বালক প্রতিপালিত হইয়া কালেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে জীবিকা উপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কত নিরন্ন অনাথাকে অন্নবস্ত্র দিতেন, অতিথির জন্য তাঁহার সৌধদ্বার সতত বিমুক্ত থাকিত। সেকালের দিনেও বৃদ্ধ সদরওয়ালা রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর রীতিমত মাষ্টার পণ্ডিত চিত্রকর রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন, সময়োচিত লেখা পড়া দিব্য জানিতেন। হস্তাক্ষর ছাপার ন্যায় সুন্দর ছিল, শিল্পকার্য্যে চিত্রাঙ্কনে, নারিকেলের বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এমন গুণবতী মাতার গুণগ্রামেই ঘোষ ভ্রাতাদ্বয় চিরস্মরণীয়। মাতৃভক্তি মাতৃসেবা মাতৃসঙ্গ সুখ লাভই তাঁহার পুত্রগণের সার ধর্ম্ম ও নিত্য আরাধনা স্বরূপ ছিল। তাঁহাদের মাতা পুত্রের স্নেহের সম্মিলন যেন যমুনা জাহ্নবীর সঙ্গমের তুল্য পবিত্র ও সে দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইয়া যাইত।

ঘোষজননী অতীব মমতার চক্ষে আমার সবই সুন্দরতর দেখিতেন এবং আমাকে বড় ভালও বাসিতেন। তাঁহাতে ও আমাতে হৃদয়ের এমন একটা গভীর বন্ধন ছিল যে উভয়ে উভয়ের ভালবাসার মর্য্যাদা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতাম। তাঁহার কন্যা ও বধূগণের সহিত আমার চিরবন্ধুতা, সেই প্রথম যৌবনে যে সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে আজি পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার মধ্যম পুত্র বধূ ৺লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী স্বর্গীয়া বরদাসুন্দরী সর্ব্বদিকে অতুলনীয়া, তাঁহার অসীম পতিভক্তি, স্বজন স্নেহ, বন্ধু-প্রীতি, সুনিপুণ গৃহিণীপনা ও দেবভোগ্য উপাদেয় রন্ধন অনুকরণীয়। সদানন্দ হাস্যময়ী সোদরা প্রতিম "মেজ বৌএর" অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদ ব্যথা ইহজন্মে আর ভুলিতে পারিব না। পতিব্রতা সতী এক্ষণে পরলোকে স্বামীর পার্শ্বে শান্তি লাভ করিয়াছেন। আমরাই কয়জন সুহৃদ্বরা "বড় বধূ" শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M. Ghose), স্নেহময়ী সহৃদয়া "ললিতমণি দিদি" ও প্রিয় ভগ্নী লালমণি শোক দুঃখে বাঁচিয়া আছি।

অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার কাল বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক বৎসর কালেজ লাইব্রেরীর কাগজপত্র গ্রন্থ সব তাহাকে অমনি পড়িতে দিত ও দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ রো বালকের প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝিয়া সাপ্তাহিক ছাত্র সভার অধিবেশনে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিতেন, তাহা অদ্যাপি কালেজ ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই সভার শাখা সমিতি প্রতি রবিবারে আমাদিগের গৃহে বসিত। বঙ্গ সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক সেখানে পাঠ আলোচনা ও সেই সব গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে লিখিত হইত। সভার সকল সভ্যই ছাত্র এবং আমিই একমাত্র মহিলা সভ্য ছিলাম। "মাইকেল", "হেমচন্দ্র", "রঙ্গলাল" (স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়,

কবিতার রচয়িতা), শেলী বাইরণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিগণের কবিতা মুখস্থ, তাহার অনুকরণ বা কথায় কথায় অনুবাদ করা হইত, "ভারত সঙ্গীত" "ভারত বিলাপ" আবৃত্তি চলিত। পিতৃদেব আমাদিগকে সমবেত আত্মীয়গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহা বলাইতেন এবং তাঁহারাও একবাক্যে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই পারিবারিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাস সঞ্জীব বাবুর "কণ্ঠমালা" ও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তজার "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রভৃতির চর্চ্চা, ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া অধ্যয়নে আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম। সেই পূজায়, বাগ্দেবী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন বোধ হয় এবং তাঁহারই বরে সেই বয়সে যে সব কাব্য ইতিহাস, গদ্য পদ্য পড়িয়াছিলাম তাহাতে জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাহাই অদ্যকার মানস সম্বল।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতৃদেবকে আবার মেহেরপুর সবডিভিসানে বদলী করা হইল ও আমার পাঠের সাহায্যার্থে মিশনরী মেম নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের ইংরাজী পাঠ অধিকাংশই বাইবেল হইতে ও যিশু ভজনার নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা। এবার পাঠের সঙ্গে পিয়ানো শিখিতে আরম্ভ করিয়া ঢং ঢং বাদ্য অভ্যাসের গভীর নিনাদে গৃহবাসীগণের দিবা নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলাম। এত পরিশ্রমের সঙ্গীত বিদ্যার সফলতা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।

মিশনরী রমণীর নিকট আমার ইংরাজীপাঠের মন্থর গতি দৃষ্টে স্বইচ্ছা প্রণোদিত জনৈক আত্মীয় আমাকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রৌঢ় গুরুজী সুপক্ক আম্র বিশেষ। মস্তকের মধ্যস্থল একেবারে কেশ শূন্য, চারিপাশের যে কয়েকটী ছিল তাহা অতি যত্নে সুগন্ধ তৈল রঞ্জিত করিয়া চোগা চাপকানে সজ্জীভূত শিক্ষক মহাশয় নিয়মমত আমাকে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার চেষ্টা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করান, আমারও যত্নের ত্রুটি ছিল না, ঘটনায় অন্যরূপ হইয়া গেল, "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোত্র দোষঃ।" শৈশবে কতকগুলি কবিতা লিখি, "তাঁহার গদ্য পদ্য কেবল চৌদ্দে জানা" গিয়াছিল কিন্তু পিতৃ স্নেহের আধিক্যে তাহা আবার পুস্তকাকার ধারণ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের কাছে আদর পাইয়াছিল, তাহার নাম "আধ আধ ভাষিণী"। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন "অমৃতং বালভাষিতং", সে যতই অমৃত হউক, অস্তিত্ব সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতা বীণাপাণির মধুর বীণা-যন্ত্র হস্তে কিম্বা কণ্ঠে কখন বাজে নাই, তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ অনুরক্ত ভক্তের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারই নিদর্শন "বনলতা" ও "নীহারিকা," প্রথম, দ্বিতীয়ভাগ, "আর্য্যাবর্ত্ত" এবং "অশোকা"। সেকালে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার না থাকায় শিক্ষিত সমাজের ভিতর আমাদিগের খুব মান সম্ভ্রম ছিল। প্রবীণ সাহিত্যকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উপযাচক হইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতে কৃষ্ণনগর

আসিয়াছিলেন।

তখন আশু কিশোর বয়স্ক, আমিও ছোট। তাঁহার সেই আগমনে আমরা অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। তিনি বহু সম্মান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "বিদুষী বঙ্গমহিলাকে আমার সাধারণীর সংবাদদাত্রী হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।" তাঁহারই যত্নে আমার কবিতা প্রতি সপ্তাহে "সাধারণীতে" স্থান প্রাপ্ত হইয়া গুণগ্রাহী পাঠকগণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ ও সুখ্যাতি লাভ করে। সিমলা শৈলবাসী একজন অজ্ঞাত বন্ধু কবিতা পাঠে আমার প্রতি মান্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"প্রসীদ প্রসন্নময়ী ভারত তনয়ে,
হের মা নয়নে তুমি,
দুঃখিনী জনম ভূমি,
তুমি কন্যা মাতৃসেবা করো অনিবার।"

"সাধারণী"র কল্যাণে আমার রচনা সাহিত্যিকদিগের নিকট প্রশংসা পাইয়া "নীহারিকায়" পরিস্ফুট হয়। তাহার অনেক প্রীতিকর * সমালোচনাও বাহির হইয়া বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর দ্বারা আদৃত হইয়াছিল ও তাহাতে আর কিছু হউক না হউক, মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ভার বহন করিতে হয় নাই, সৌভাগ্যবশতঃ পুস্তকগুলি বিক্রয় হইয়াছে। যে দেশে চাহিয়া লইয়া পড়া রীতি কখন বা পুস্তক "আত্মবৎ পর-দ্রব্যেষু" করিয়া "বসুধৈব কুটুম্বকং" জ্ঞানে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছাও থাকে না, সে দেশের বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টিপাত সময় সাপেক্ষ।

মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের রণভেরী শ্রবণে সমবেত রাজন্যগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির অপ্রতিহত বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে যেমন নবযুগের অবতারণা হইয়াছিল এও সেইরূপ সাহিত্যের সত্য যুগোৎপত্তি। এ সংগ্রাম নহে, এ সন্ধি, বিদ্বজ্জন সমাগম মাতৃ-পূজার মহোৎসব, বাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সারথ্যে বঙ্গসাহিত্যের জয়, বঙ্গ-দর্শনের শুভাগমন। প্রতিভাশালী এতগুলি মাতৃ-সেবকের একত্র সম্মিলন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। মায়াপুরীর অপূর্ব্ব কাহিনী "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "কমলাকান্তের দপ্তর", রাজকৃষ্ণের অরুণকিরণময়ী "উষা", ফুরফুরে বসন্ত বায়ুর ন্যায় দীনবন্ধুর "রাত পোহাল, ফর্সা হলো, ফুটলো কত ফুল", চন্দ্রশেখরের বৈরাগ্যোদ্দীপক "শ্মশান", হেমচন্দ্রের কোমল "বঙ্গনারী", অক্ষয়ের বিচিত্র "গ্রাবু", এবং চন্দ্রনাথের "শকুন্তলা তত্ত্ব" বাগ্দেবীর পূজোপচার পাদ্য, অর্ঘ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য বিশেষ পুষ্প চন্দনের সৌরভিত অপার্থিব উপকরণ সব

* সরকার মহাশয় "নীহারিকার" সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন, "চর্ম্মচক্ষে দেখিতে গেলে "নীহারিকা" ছায়াময়ী, দূরবীক্ষণের মর্ম্মচক্ষে দেখিতে গেলে "নীহারিকা" কায়াময়ী।"

মাতা সরস্বতীর পাদপদ্ম সমুজ্জ্বল করিয়া এমনি রহিবে, কালের চঞ্চল গতির সহিত কখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। "বঙ্গদর্শন" গিয়াছে, তাহার শক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় লেখকগণের অধিকাংশ অদ্য লোকান্তরে, কিন্তু তাঁহাদিগের অলৌকিক অমরপ্রতিভা চির-জীবন্ত, কখন বিলুপ্ত হইবে না।

"বঙ্গদর্শনের" নবযুগে পরস্ব অপহারক গ্রন্থকারগণের সমূহ বিপদ ছিল। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় কে কোথায় যে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে তাহাদের প্রেতাত্মারও আর দর্শন পাওয়া যায় না। গাত্রজ্বালায় জনৈক রসিক গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন "ডিপুটী বিভূতি যোগ"। তিনিও তাহার এক ছত্রে দিব্য সমালোচনা করিয়াছিলেন, "পুস্তিকা হস্তিকা রোগ"। মাইকেল দত্ত তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কোন এক পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন "চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে, করি ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা জলে," ইহাতে তাঁহার অনেকখানি ক্রোধের ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থির গম্ভীর অটল বঙ্কিমচন্দ্র শরীর ও মনের কোনখানে কিছু স্পর্শ করিতে না দিয়া এমন মর্ম্মভেদী সমালোচনা করিতেন যে বঙ্গ ভাষায় তাহার দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। "মৃন্ময়ী" পাঠান্তে লিখিয়াছিলেন, "অদূরে দামোদর দণ্ডায়মান, উপন্যাস লিখিব কি? লিখিলেই উপসংহার লিখিয়া ফেলিবে।" এই মিছরীর ছুরিকাঘাতে অর্ব্বাচীন সফ্‌রী লেখকগণের "কলাপাতা না এড়াতে গ্রন্থ লেখার সাধ" মিটিয়া যাইত।

আমরা প্রতি মাসের প্রথমে বঙ্গদর্শনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম ও পত্রিকা আসিবামাত্র আগে লইবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া যাইত। অধ্যয়ন আলোচনা এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষমতানুসারে গদ্য পদ্য উপন্যাসের দোষগুণের বিচার হইয়া সমালোচনা পর্য্যন্ত লেখা হইয়া যাইত, সেটা আমাদের পক্ষে হিতকর ছিল। আমরা সেই হইতে মাতৃভাষাকে আরো প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। সে ভক্তি প্রীতি মৌখিক নহে অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ। পল্লীগ্রামে যে সকল আত্মীয় বন্ধু "বঙ্গদর্শন" দেখিতে পাইতেন না আমি অদম্য উৎসাহে তাঁহাদিগের জন্য সমগ্র পত্রিকা প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইয়া দিতাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বা আলস্য বোধ হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রের সেই সব মহারথীগণের শিরচ্যুত মন্দাকিনীর পূতবারিধারে আমাদিগের তরুণ জীবন সুধাসিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

পুত্রগণের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত পিতৃদেব কৃষ্ণনগরের প্রান্ত ভাগে একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া মাকে সন্তানদিগের সহ সেইখানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যান। নিজের সুখ কিম্বা আরাম কখন ভাবিতেন না, একাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া স্নেহের নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য পালনে সুখী বোধ করিতেন। সন্তানগত প্রাণ, তথাপি দূর দেশে একা থাকিয়া একদিনেও জন্যও কঠোর কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা

করেন নাই। বিদেশে কত রোগ, দুর্দ্দৈব ভোগ করিয়াছেন, অশ্ব হইতে পড়িয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিয়াও ছেলেদিগের পাঠের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া মাকে সেবা শুশ্রূষার কারণ নিকটে লইয়া যান নাই। তাঁহার এই আত্মত্যাগের মহান্ দৃষ্টান্ত কতক অনুসরণ করিলে আমরাও ধন্য হইব।

আমাদিগের কৃষ্ণনগরের ছোট খাট গৃহখানি ভাবুক চিত্তবিনোদন প্রকৃতির মুক্তভাবে আলেখ্যবৎ সুন্দর ছিল। চারিদিকের দৃশ্য এমন চিত্ত মুগ্ধকর, শ্যামল লতা-পল্লবে, গগনস্পর্শী দেবদারু বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত নির্জ্জন শোভায় তাহা কল্পনায় রচিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। চির বসন্ত বিরাজিত তরুকুঞ্জে অবিশ্রান্ত পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইত। পূর্ণিমা রজনীর কৌমুদী প্রপাতে যখন সমুদয় প্রান্তর, আম্র কানন, ক্ষুদ্র সৌধ এবং সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান একাকার হইয়া যাইত, তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য সব যেন এক দ্রবীভূত চন্দ্রকর ভিন্ন কিছুই আর প্রতীয়মান হইত না। জীবনের উত্তমাংশ যৌবন যেখানে অতিবাহিত হয়, সেই স্থানই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূত আবাস-ভূমি বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাহাতে আবার সেই গৃহে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভগ্নী "সৌদামিনী", ভাই সুহৃদ ও অমির জন্ম হয়। তাই সেই গৃহের সহিত কত সুখের, কত উৎসবের এবং কত আনন্দের স্মৃতি বিজড়িত।

শ্রীমান সুহৃদনাথ চৌধুরীর জন্ম পরেই আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গারোহণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে চক্ষে দেখিয়া যান নাই, জন্ম সমাচার পাইয়াই সেই মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও শিশুর ভাগ্য গণনা করাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, কালক্রমে "বালক সৌভাগ্যবান, সুপণ্ডিত" ও তাঁহার আশানুরূপ হইবে। আচার্য্যকে কোষ্ঠীর শুভ ফল দৃষ্টে যথেষ্ট পুরস্কারও দিয়াছিলেন। অমিয়নাথের শুভাগমন তাঁহার মৃত্যু পরে। অমির জন্ম রাত্রিকালে, দিব্যশ্রী শিশুর সদ্যঃপ্রসূত রমণীয় কান্তি দেখিয়া তখনি জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা মিলিয়া অমিয়নাথ নামকরণ করিয়াছিল। সেই রাত্রি হইতে অমিয় চির অমিয়, কথায় বলে, "শেষ যার দেশ তার"; অমির সম্বন্ধে এ কথা খাটিয়াছিল। আদরে, পুত্ররত্ন লাভে সর্ব্ব কনিষ্ঠ, মাতৃক্রোড় বহুকাল অধিকার করিয়া সাত বর্ষেও স্কুলে যায় নাই। তাহার পর "বর্ণ-পরিচয়ের" সঙ্গে সঙ্গে বড় উৎপাত আরম্ভ হয়, ভ্রাতাগণের মূল্যবান নূতন পুস্তক দেখিলেই উল্টা অক্ষরে নাম লিখিয়া ফেলিত ও তাহা বলিলে নিঃসঙ্কোচে বলিত, "আমাকে কিছু বলো না, আমি মায়ের কোলের ছেলে।" তখনও আমাদের গৃহে অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বালক থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত, অমিয় তাহাদের সঙ্গে সমানভাবে চলিত। তাহাদিগের যেদিন যেমন সাজে স্কুলে যাইতে দেখিত, সে-ও সেদিন সেই সাজে যাইত, তাহাতে কোনদিন জামা-শূন্য উত্তরীয় মাত্র পরিয়া প্রখর রৌদ্রে রিক্ত পদে তাহাদের সঙ্গী হইত। ভৃত্যবাক্য কিছুতেই মানিত না। বাৎসরিক পরীক্ষায় অমিয় একবার অতিশয় গর্ব্ব সহকারে কলেজ হইতে

আসিয়া বলে সে "সর্ব্বপ্রথম" হইয়াছে। কত নম্বর পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উৎসাহে বলিয়াছিল, "কেবলই গোল্লা, কেবলই গোল্লা।" সে গোল্লা যে রসগোল্লা কি কাঁচাগোল্লা নহে, শূন্য মাত্র যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন নীরবে কাঁদিয়া জ্বর আনিল। পরদিন প্রাতে অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না, কাহাকে কিছু না বলিয়া কলেজে যাইয়া আবার নূতন পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ হইয়া লজ্জা দূর করিয়াছিল। আশৈশব সরল স্নেহশীল ও পরদুঃখকাতর খাঁটি-হৃদয় অমিয় সহপাঠীগণের অভাব মোচনে এখনও মুক্তহস্ত।

নাটকাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় সদলে এক বার কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন পিতৃদেবের সহিত বন্ধুত্ব থাকায় তিনি আমাদিগের গৃহে ৺উপেন্দ্র দাসের "শরৎ সরোজিনী" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। দৃশ্যপট ও অন্য সব সরঞ্জাম রীতিমত না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সেই অভিনয় দর্শনে আমরা ত সকলে মুগ্ধ হইবই, আমাদের ছোট বোন "সৌদামিনী" অতি ক্ষুদ্র বালিকা হইয়াও নির্ব্বাকভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহা দেখিয়া শুনিয়া পরদিন নিজ নাম "সৌদামিনী" খারিজ করিয়া "শরৎ সরোজিনী" নাম লইয়াছিল। সে অতি বুদ্ধিমতী সুচতুরা বালিকা ছিল, তাহাকে কেহ কথায় কিম্বা কার্য্যে ঠকাইতে পারিত না। পিতৃদেব একদিন তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন, সে অন্যমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া যাইতেছিল, তাহাতে তিনি বড় বিরক্তভাবে বলিয়াছিলেন, "তুমি লেখাপড়া ভালরূপে না শিখিলে বিবাহ-কালীন যোগ্যতর পাত্র পাইবে না।" তাহাতে সে অমনি বলিয়া উঠিয়াছিল, "মা ত ভাল লেখাপড়া জানেন না, তবে কেমন করিয়া আপনার মত সুপাত্র পাইয়াছেন।" তাহার এই উত্তরে তিনিও অত্যন্ত হাসিয়া তাহাকে খেলার ছুটী দিয়াছিলেন ও সেখানে অন্য যাঁহারা সব বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত কৌতুকানুভব করিয়াছিলেন।

পিতৃদেবের সময় হইতেই আমাদিগের গৃহে শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চ্চা এমনি হইয়া আসিতেছে। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী এবং বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। একবার কৃষ্ণনগরের যুবকগণের উৎসাহে সেখানে "বসন্ত মেলা" হয়। ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় তখনকার স্বদেশী দলের ব্যায়ামের নেতা ছিলেন। তিনি বহুতর ছাত্র সমভিব্যাহারে মেলায় উপস্থিত হইয়া ব্যায়াম প্রভৃতি দর্শনান্তর কন্‌সার্টপার্টির গান বাদ্য শুনাইয়া কলেজের ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বৃদ্ধগণ "ছেলে ধরার ভয়ে" ভীত হইয়া উঠেন, যুবকেরা সব চাঁদা তুলিয়া আরো দিন কতক তাঁহাকে সদলে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যখন এইরূপ অবস্থা তখন আমাদের গৃহে তিনি সর্ব্বসহ একদিন আসিয়া কন্‌সার্টপার্টির ঐক্যতানিক বাদনে সকলকে আমোদিত করিতে ব্যগ্র হন। কন্যা প্রিয়ম্বদা শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত এবং মাতামহের যথা অযথা আদরে কাহারো কথা মানিত না। কন্‌সার্ট উপলক্ষে

সেদিন সকাল হইতে বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ, দুষ্ট ছেলে মেয়েরা ঐরূপ দিনে আরো বাড়িয়া উঠে ও শত প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া গৃহের শান্তিভঙ্গ করে। সময় বুঝিয়া প্রিয়ম্বদার উপদ্রবটা সেদিন আরো বাড়িয়া যায় ও কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমাগত পিতৃদেবের নিকট অভিযোগ করিতে থাকে, তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে না পারিয়া মা বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগে পড়ো নাই, কদাপি পিতামাতার অবাধ্য হইবে না।" তৎক্ষণাৎ সেও চট্‌পট্ উত্তর দেয়, "পিতা মাতার অবাধ্য হইতে মানা, বিদ্যাসাগর মহাশয় ত মাতামহ মাতামহীর কথা কিছু বলেন নাই" — দুরন্ত ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই উত্তর শ্রবণে সেই সমাগত বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উচ্চ-হাস্য পড়িয়া যায় ও গায়ক বাদকদিকের ভিতর হইতে উঠিয়া মিত্র মহাশয় তাহাকে সুন্দর সুন্দর খেলানা উপহার দিয়া তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অশেষ সুখ্যাতি করিতে থাকেন।

পিতৃদেবের সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের সম্যক ইতিবৃত্ত সুখপ্রদ ছিল না। স্বাধীন-চেতা, উদারনৈতিক ব্যক্তির দৃঢ় কর্ম্ম-বন্ধনে যেরূপ কষ্ট ভোগ ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে তাঁহারও অদৃষ্টে সেইরূপ হইয়াছিল। নদীয়া জেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গ-দেশের নানাস্থান ঘুরিয়া পরিশেষে বেহার ত্রিহুত প্রভৃতির শেষ সীমায় যাইতে হইয়াছিল। কোথায় মেহেরপুর, আর কোথায় মতিহারী চম্পারণ কিছুই তাঁহার কপালে বাদ যায় নাই। সাপ্তাহিক বিধিলিপিতে স্থানান্তরিত আজ্ঞা যখন তখন লিখিত হইয়া যাইত এবং সেই অখণ্ডনীয় বিধান মস্তক পাতিয়া লইতে হইত। সাবডিভিসানে এক একজন হাকিম ছোটখাট লাট বিশেষ, পিতৃদেব এ লাটপদের মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া কয়েদীর দ্বারা গৃহকার্য্যের জল বহন করিয়া আনাইতেন না, চৌকিদার দিয়া প্রাঙ্গণ ঝাঁট দেওয়াইয়া ভূঁইমালীর বেতন কাটাইতেন না ও নাজিরকে বাজার সরকার পদে বরণ করিয়া অর্দ্ধমূল্যে হাট বাজার করাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার চাপরাশী বহু পুরাতন হাকিম-চালক, পরামাণিক পুত্র, ক্ষুদ্র লাটত্ব পদ গ্রহণে তাঁহার চক্ষু কর্ণের অগো-চরে সেরেস্তাদারদিগের সহিত সমান ভাবে চলিয়া সর্ব্ব জীবনে ভীতি উৎপাদন করিত। এক সময় কার্য্যগতিকে কয়েক মাসের নিমিত্ত আমরাও চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসানে গিয়াছিলাম ও অমিকে অল্প দিনের জন্য সেখানে স্কুলে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাকে চৌকিতে পৃথক বসিতে দেওয়া হইবে কিম্বা সাধারণ বালকগণের সঙ্গে একত্র বেঞ্চে বসিবে জানিবার প্রয়োজন হওয়াতে হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র আইসে। চাপরাশী প্রবর তাহার উত্তর লইয়া স্কুলে যাইয়া হেডমাষ্টারের সহিত একাসনে বসিয়া অনেক উপদেশ দিয়া অমির অন্য সব বালকের সহিত একত্র উপবেশন অনুচিত হইলেও প্রভুর আদেশ সর্ব্বসহ একত্র বেঞ্চে বসা জানাইয়া আইসে। অমিয় তাহার এই অভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত

লজ্জিত ও কুপিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া সব বলিয়া দেয়। পিতাঠাকুর তাহাতে নরসুন্দরকে অনেক ভর্ৎসনা করিলে সে সহাস্য মুখে বলিয়াছিল, "অগ্রবর্ত্তী হাকিমদিগের সময় সাব ডিপুটী বাবুগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত, পিনাল কোডের ধারা শিক্ষা দিয়া নবাগত সিভিল সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ যুবক কত তরাইয়া দিয়াছে, বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত স্কুল মাষ্টার তাহার নিকট মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত নহে।"

এইখানেই এক বৃদ্ধ চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া পিতৃদেবের নিকট আনীত হইলে বিচারে সাত দিনের কারাদণ্ড হইয়া যায়। অপরাধী পূর্ব্ববঙ্গীয় পল্লীবাসী সরল ব্যক্তি। আড়কাঠির হাতে পড়িয়া অর্থ লোভে গৃহত্যাগী হইয়া আইসে, পরে কুলীর সর্দ্দারের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া পলাইয়া পদব্রজে চুয়াডাঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হয় ও নিকটে কোন প্রকার সম্বল না থাকায় তিন দিবস একাদিক্রমে উপবাসী থাকিয়া এক কাঁঠাল গাছের তলে বসিয়া ঐ গাছের একটি পতিত পক্ক কাঁঠাল কুড়াইয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক কার্য্যদক্ষ চৌকিদারের চক্ষে তাহা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে সদরে চালান হইয়া আইসে ও ভারতীয় পিনালকোডের সূক্ষ্ম নৈতিক দণ্ডবিধির ধারানুসারে দোষী প্রমাণ হইয়া সপ্তাহ কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানার আদেশ দিতে পিতৃঠাকুরও বাধ্য হন। তখন সে তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সত্যভাবে বিবৃত করিয়া জেলে যাইতে চাহে ও সেখানে যত কষ্টই হউক না কেন, অর্দ্ধাহারেও কতকটা ক্ষুধা শান্তি হইবে ভাবিয়া জেলেই যাওয়া ইচ্ছনীয় মনে করিয়াছিল। সপ্তাহ পরে কারামুক্ত হইলে পিতৃদেব তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া দেশে যাইবার পাথেয়, নূতন ধুতি চাদর ও বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই দীনহীন বৃদ্ধ গৃহযাত্রাকালীন পিতাকে দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিল, "দাদা ঠাকুর, তোর বড় ব্যাটা উপর আদালতে বসিবে। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হইয়া থাকৃবি ও জীবনে তুই যেন কোন শোক না পাস্।"

পিতৃদেবের দ্বারভাঙ্গা গমনের প্রথম বৎসর আমরাও সব সঙ্গে গিয়াছিলাম। দ্বারবঙ্গাধিপতি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স প্রযুক্ত ম্যানেজারের হস্তে রাজত্বের ভার থাকায় সহরটা বড় অপরিচ্ছন্ন এবং ধূলি ধূসরিত ছিল, রাজপথ ও বাজার বিপণিতে রাজশ্রীর কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত না। সমস্ত সহর খুঁজিয়া বাসোপযোগী একটাও বাড়ী আমরা না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বতন হাকিমের পরিত্যক্ত গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। একে ত্রিহুতের সঞ্চিত ধূলিরাশি তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্ম আমাদিগকে নিতান্তই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এক পক্ষ কাল অতীত হইতে না হইতে ভয়ানক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে সহরে হাহাকার পড়িয়া গেল এবং অসংখ্য নরনারী মৃত্যুগ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। দিবারাত্র শববাহকের "রাম নাম সত্য হ্যায়" শুনিতে শুনিতে আমাদিগেরও আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে একজন ধনী মহাজনের

কৃপায় তাঁহার নগরীর প্রান্ত গৃহে আমরা সকলে উঠিয়া গেলাম এবং সেই নিশীথেই মৃত্যুরূপী করাল কাল আসিয়া অতিশয় স্নেহপাত্রী সৌদামিনীকে অকালে অসময়ে অপহরণ করিল এবং সুহৃদও জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদিগকে একেবারে শোকাভিভূত করিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা দিবার কেহ নিকটে ছিল না এমনি অবস্থা, ভগবানের অসীম দয়া ও মাতার প্রাণপণ সেবায় বালক সুহৃদের জীবন রক্ষা হইবামাত্র আমরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম, আর কখন দ্বারভাঙ্গা যাই নাই। পরে জনশ্রুতি এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে মহারাজার রাজ্যাভিষেকের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই রাশীকৃত আবর্জ্জনা গো-শকটে চড়িয়া রাজনগরীর সুদূর প্রান্তভাগে চলিয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ রজত মুদ্রা তাহার স্থান অধিকার করিয়া ধনাগারের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তখনকার ছোটলাট বাহাদুরও সেই সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ ব্যয় করাইয়া সহরটী দ্বারবঙ্গাধিপের রাজধানী নামের যোগ্যতর করিয়া দিয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্যবশতঃ পিতৃদেব যে সব স্থানে গিয়াছিলেন আমরাও তাহার অধিকাংশই দেখিয়াছি। একবার বড় দিনের অবকাশে আমরা সকলে মিলিয়া মজঃফ্ফরপুর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দিব্য পরিপাটী সহরটী, বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ, প্রবাস বলিয়া মনে হইত না, যাওয়া আইসা আদান প্রদান সব দেশের মতন, দোল দুর্গোৎসব বার মাসে তের পার্ব্বণ রীতি মতন ছিল। সে কালে পশ্চিমে এক একজন অতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য উদার চরিত্রের কথা অদ্যাপি ভুলিতে পারা যায় না। যেমন দ্বারভাঙ্গায় কালীবাবু ডাক্তার, দীন দুঃখীর একমাত্র আশ্রয়, তেজ গর্ব্বে যেন জলন্ত বৈশ্বানর। নীচতা তোষামোদ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। পাটনার "প্রসন্ন সিংহ", সিপাইবিদ্রোহের সময় শত শত লোকের জীবন বাঁচাইয়া এবং মৃতব্যক্তির অনাথ স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তেমনি আবার মজঃফ্ফরপুরে কেদার বাবু, দান ও পরোপকারে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অবসর দিনে তিনি পাড়ায় পাড়ায় যাইয়া কত নিরন্নকে অন্ন বস্ত্র দিয়া গৃহহীনকে গৃহ প্রস্তুত করিবার অর্থদানে ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় দানশীল সদাশয় ব্যক্তি আজ কালের দিনে বড় দুর্ল্লভ।

পূর্ব্বে ঐ সব অঞ্চলে প্লেগ কিম্বা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না থাকায় অনেক কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সেখানে যাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে পরিপুষ্ট দেহে দেশে ফিরিয়া আসিতেন, প্রাতঃভ্রমণই ঐ সকল স্থানে স্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায়। আমরাও প্রত্যহ তাহা প্রতিপালন করিতাম। একদিন দৈবাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে একটি রহস্যজনক ঘটনা হইয়াছিল। আমার শরীর অসুস্থ

থাকায় সকলে বেড়াইতে চলিয়া যান। আমি শালে মস্তকাবৃত করিয়া একা বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম, এমন সময় চোগা চাপকান পরিহিত একজন ভদ্রলোক সহাস্যমুখে বৈঠকখানায় আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক পার্শ্বের চৌকীতে বসিয়া নানা প্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞান বিবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া নিজের মতামত প্রকাশ ও আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি ত অবাক, একে অতি অপরিচিত, নামও জ্ঞাত নহি, তাহাতে বাড়ীতে কেহ নাই, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাকে সম্বোধন করিতে করিতে নানা বিষয় স্বাধীনভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইরূপে গত হইলে পিতৃদেব ভ্রাতাগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবুটি "এই যে দুর্গাদাস বাবু, Good morning, Good morning, আমি ঢেরক্ষণ আপনার বড় ছেলের সহিত বসিয়া গল্পস্বল্প করিতেছি। দিব্য ছেলে মশায়, বেশ বেশ" বলিয়া খুব হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই কৌতুকাবহ ব্যবহারে পিতৃঠাকুরও হাসিয়া আমার মাথার শাল অপসারিত করিয়া দিবামাত্র মুক্তকেশরাশি বাহির হইয়া পড়িলে তিনি তখন অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ নতমুখে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, ঠিক আগুরই মতন দেখিতে। আজ হইতে ইনি আমার মা হইলেন, আমি ছেলে, কাল আমার বাড়ী আপনাদিগের মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ।" তাহার পর সে ভোজের আয়োজন একটা পর্ব্ব বিশেষ। আদর আপ্যায়ন আশাতীত হইয়াছিল। এই আত্মীয়টী কলুটোলার সেন মহাশয়গণের জামাতা ইঞ্জিনিয়ার ৺মাধব বাবু।

আমরা মজঃফ্‌ফরপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পরেই পিতৃদেব আবার মতিহারী চম্পারণ বদলী হইয়া যান। তৎকালে তাঁহার নিকট আর কেহ ছিল না, কেবলমাত্র লুসি কুকুর ও হাণ্টার ঘোটক সহচরস্বরূপ থাকায় তাহাদিগকে লইয়া কোনরূপে অবসর কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু মতিহারী গমনকালে ঘোড়া সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়ায় পুরাতন বিশ্বাসী সহিস সহ হাণ্টারকে পথ হাঁটাইয়া কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দেন, লুসি হাণ্টারে অতিশয় সদ্ভাব ছিল, সর্ব্বদা উভয়ে একত্র থাকিত। প্রিয় বন্ধু হাণ্টার সাহেব চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া লুসি বিবি কুকুর ক্রন্দন স্বরে চারিদিকের শান্তিভঙ্গ করিয়া তুলিল এবং খানিক পরে আবিষ্কার হইয়া গেল যে লুসি আর গৃহে নাই। অনেক খোঁজ তল্লাসেও তাহাকে কোনখানে না পাইয়া পিতৃদেব তার করিয়া দিলেন। আমরা খালি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন সপ্তাহ অনবরত হাঁটিয়া ছাতু দানা ও সহিসের উচ্ছিষ্ট চাপাটী প্রসাদে জীবন ধারণ করিয়া লুসি যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার আকৃতি অতীব শোচনীয়। কোথায় বলবান দীর্ঘকায়, শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের রণজয়ী অশ্ববৎ তেজস্বী হাণ্টার, আর কোথায় ক্ষীণজীব ক্ষুদ্র সারমেয় লুসি। তুলনায় কোন অংশেই এক নহে, তথাপি ভালবাসার আতিশয্যে

এই দুই পশু-জীবন এক হইয়া গিয়াছিল, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সমস্ত দিবস বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী রূপে থাকিয়া রাত্রে লুসি হাণ্টারের পদতলে পড়িয়া ঘুমাইত। তাহাতে কখন কোন প্রকারে অশ্বক্ষুরে আঘাত পায় নাই। উচ্চ নীচে বড়তে অকৃত্রিম স্নেহের কেমন মধুর সম্মিলন হইয়া গিয়াছিল। গৃহপালিত জীব জন্তুর দৈনিক জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

আশু কলিকাতায় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় পিতৃঠাকুর ভাগলপুর যাইবার পথে একবার তাহাকে দেখিতে আসিয়া ভূতপূর্ব্ব ছোট আদালতের জজ ও তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু ৺কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া গৃহে উৎসবের আয়োজন, নহবৎ, রসনচৌকী, চণ্ডীপাঠ ও নানাপ্রকার আতসবাজীর সমারোহ দেখিয়া শুনিয়া অমনি ত্রস্তভাবে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং আসিয়া হস্ত ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন না এবং তখনকার ছোটলাট সার এস্‌লি ইডনের অভ্যর্থনা সান্ধ্যসমিতি—পুত্র কন্যার বিবাহ নহে বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাসমারোহে লাট শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর ছোট বড় রাজা মহারাজা সব আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও সেলামের ধূম পড়িয়া গেল। কেবল পিতৃদেব আশু সহ একটী কোণে একক বসিয়াছিলেন, হঠাৎ সেইদিকে লাটের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনিই অভিবাদন করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন এবং পিতাঠাকুর কখনই দেখাশুনা করেন না কেন জানিতে চাহিলে তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "দেখা করিয়া অকারণ জ্বালাতন করা আমার উচিত মনে হয় না, উপকারও কিছু নাই। নিজের কর্ত্তব্য করিয়াই সুখী থাকি।" ইডন লাট আশুকেও দেখিয়া অনেক ভদ্রতা দেখাইয়া জানিতে চাহিলেন, কোন চাকুরী প্রার্থী কি না? পিতা তৎক্ষণাৎ নির্ভীকচিত্তে মুখের উপর বলিয়াছিলেন, "না,—দাসত্ব করিতে দিব না, বি, এ, এম, এ, একসঙ্গে দিয়াছে, বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করাইয়া আনিব।" এই অভাবনীয় উত্তরে লাটের লাল মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল ও কৃত্রিম হাসি হাসিতে হাসিতে "গুডবাই বাবু" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ইহাতে কুঞ্জলালবাবুর শুষ্ক মুখ ও ভয়বিহ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারাও অচিরাৎ বিদায় গ্রহণে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এই বৎসরই ১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসে আশু বিলাত রওনা হইয়া যান। তাহাতে পাবনা রাজসাহী জেলায় একটা মহা হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হয়। আশু বিলাত যাওয়ার পর গ্রামের জ্ঞাতিবর্গ পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীদিগের জীবনের শান্তি-ভঙ্গ, জাতিনাশ ও সমাজচ্যুতির ভয় প্রদর্শনে তাঁহাদিগকেই একান্ত কাতর ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচ বর্ষে স্বভাবতঃ এ সব গোল মিটিয়া যাইবার কথা, কিন্তু মক্ষিকা ছিদ্রানুসন্ধানীর ন্যায় জাত্যভিমানীগণ পশ্চাতে লাগিয়া থাকিত

এবং আশুর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন গোলযোগ উঠাইয়া এবার রীতিমত আমাদিগকে "এক ঘরে" করিয়া দিলেন, জাত গেল আমাদের, তাহার জন্ত অশান্তি ভোগ ঘটিল পিসিমাতাদিগের ভাগ্যে। সাংসারিক সুচতুর ব্যক্তিরা সময়কালীন আসিয়া পিতাকে গোপনে নিশীথ অন্ধকারে আশুর সহিত আহার ব্যবহার করিতে এবং প্রকাশ্যে দূরে থাকিয়া জাতি রক্ষার্থে উপদেশ দিতেও পরাঙ্মুখ হইলেন না। যদিও এ হিত বাক্য ও শুভ ইচ্ছা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বৃথা হইয়া গিয়াছিল, তবুও তাঁহাদিগের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অচল অটল পিতৃদেবের সেই একই কথা, "সমস্ত ছাড়িব, আশুকে কখন দূরে রাখিয়া জাতরক্ষা করিব না, আশু আমার সর্ব্বস্ব, তাহাকে আমিই বিলাত পাঠাইয়াছি, জাত যাইবার ভয় থাকিলে এ কার্য্য করিতাম না, ক্রমে আমার সব ছেলে বিলাত যাইবে।" তাঁহার এই দৃঢ়তায় ক্রমশঃ জ্ঞাতি বন্ধু জাত লইয়া পলায়ন করিলেন। আমরা আমরাই রহিয়া গেলাম।

সেকালে বিলাত যাত্রা এমন সহজ ছিল না, বিশেষতঃ আমাদের ঘরের ছেলের পক্ষে সে যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারাও শক্ত। আমাদিগের বংশের ও জেলার আশুই প্রথম বিলাত গমন করেন এবং আমরা কেহ সমাজে উঠিবার জন্য কখন কোন প্রকার প্রয়াসও পাই নাই। এমনি সামাজিক শাস্ত্রের বিধান যে জাত গেল আমাদিগের, মধ্যে পিসিমাতাগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়া পাঁচ পাঁচ কাহন কড়িতে মস্তক মুণ্ডন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহারা ত বাল-বিধবা, আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়া চলিতেন, অকারণ কেন তাঁহাদিগের জাতি লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, সেটা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না ও নাই।

নিঃসন্তান বিধবা পিসিমাতারা চির-জীবন আশার আনন্দে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে ভ্রাতুষ্পুত্রগণের, বিশেষতঃ আশুর হস্তের অগ্নি জলপিণ্ডে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাহা হওয়া দূরে থাকুক, অন্তিম কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। জ্যেষ্ঠতাত পুত্র নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদা মহাশয়ও তখন লোকান্তরে, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেদের শ্রাদ্ধ, "কাম্য বৃষোৎসর্গ" ও ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়া দেশের যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য সব গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা আনাইলেন। হরিপুরের "মণ্ডপের আঙ্গিনায়" কানাট ফেলিয়া তাঁহারা তাহার ভিতর হইতে স্বীয় শ্রাদ্ধ কার্য্য, দান ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ে জীবনের শেষ ক্রিয়া সমাধান্তর নিরুদ্বিগ্ন ও সার্থক মানস হইলেন। প্রাচীন মৃত ব্যক্তির অনিবার্য্য অন্তিম কার্য্য শ্রাদ্ধ বাসরেই, আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে কত আঘাত লাগে এবং ব্যথিত অশ্রুজল রোধ করিতে পারা কত শক্ত হইয়া উঠে, আর জীবিতে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিতেছেন দেখিয়া কেহই রোদন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই

শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলেন, শুনিয়াছি তাঁহাদিগের শোকাশ্রুপাতে বক্ষস্থল সিক্ত হইয়া গিয়াছিল ও গৃহের পুরাতন দাসদাসীরা পর্য্যন্ত হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়াছিল। জীবিতাবস্থায় শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন সংযম, কাঁচা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর দিবস প্রাতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সিক্তবস্ত্রে শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ ও আর আর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদন পূর্ব্বক অনশনে কুশশয্যায় রাত্রি দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিনে হবিষ্যান্ন গ্রহণ বিধি।

প্রায়োপবেশন, মাঘের শীতে ত্রিবেণীতে কল্পবাস, এবং কাম্য বৃষোৎসর্গ ইত্যাদির কঠোরতা পালন করিবার সাধ্য হিন্দু বিধবা নারী ভিন্ন জগতে কাহারো নাই। যাঁহারা মৃত পতির সহিত জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, যাঁহারা শত্রু হস্ত হইতে সতীত্ব মান রক্ষার্থে "জহর ব্রত" গ্রহণে আত্মজীবন জলন্ত হুতাশন গ্রাসে সমর্পণ করিয়াছেন, সে জাতির তুলনা কোথায় মিলিবে আর ?

রাজসাহী জেলায় "কাম্য-শ্রাদ্ধ" এ পর্য্যন্ত আর কেহ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পিতৃদেব বারেন্দ্র পদমর্য্যাদা ও সামাজিক উচ্চ অধিকার অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের হিত কামনায় তাহাকে যে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কুলপাবন সৎপুত্রের দ্বারা বংশগৌরব বাড়িয়াছে এমন নহে। বঙ্গজননীরও সমূহ কল্যাণ সাধন হইয়াছে বলিলে গর্ব্ব করা হইবে না।

বিলাত প্রত্যাগতদিগকে পরিহার করিয়া জাতিরক্ষা করিতে যাইলে আমাদিগের কোন দিকেই উন্নতির আশা নাই। তাঁহারাই আজকাল জাতীয় জীবনের আশ্রয়স্বরূপ। বিদ্যাবুদ্ধি পদমান এবং কার্য্যদক্ষতায় তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। স্বদেশের দুর্গতি দূর, জাতীয় অভাব মোচনার্থে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক বৃথা জাত্যভিমান বিস্মৃত হইয়া বিলাত ফেরতদিগের সহিত একত্রে সম্মিলিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে যে সকল অভাব প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, তাহা অচিরাৎ বিদূরিত করিতে পারিবেন ও তাহাদিগকে লইয়া যে সমাজ গঠন করিবেন, তাহাই স্থায়ী কল্যাণকর আদর্শ সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইবে।

আশুর বিলাত যাত্রার সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও যাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়ই সাহিত্যানুরাগী, কাজে কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবী ফল সুখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত। আমরা তখন "তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই"। নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবির "ভগ্ন হৃদয়" হস্তগত হয়। সে সময় একা আমিই পিতৃদেবের নিকট আরায় ছিলাম। একে

তিনি সরকারী কাজ কর্ম্মে বিব্রত, তাহার উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুদূর বিদেশে পাঠাইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও নিরানন্দ থাকিতেন। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ প্রত্যহ সায়াহ্নে আশুর প্রেরিত "ভগ্ন হৃদয়" পড়িয়া শুনাইতাম, মনোযোগ সহ শুনিতেন, মতামত কিছু প্রকাশ করিতেন না, তবে সেদিনের যুবক কবির পুস্তকের নাম যে "ভগ্ন হৃদয়" সেটা তাঁহার হয়ত ভাল লাগিত না। সে অতীত "ভগ্ন হৃদয়" রাজ্য হইতে অদ্যকার সাহিত্য সম্রাট কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন অনেক দূর ঊর্দ্ধে, তবুও সেদিনের এই ক্ষুদ্র "পূর্ব্বকথা" স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় নাই।

আশুর কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতা আগমনের সঙ্গে কবিবরেরও ভ্রাতৃপ্রতিম সত্য বাবুর সর্ব্বদা আসা যাওয়া আলাপ আপ্যায়িতের সুখের দিনগুলি দিব্য সার্থক বলিয়া মনে হয়। প্রবাস যাত্রাকালীন পথি মধ্যে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুষ্পুত্রীর যোগ্যতর পাত্র, হস্তের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যৎ শুভকার্য্যের জন্য পূর্ব্বেই যে মৌখিক রিটেনার দিয়াছিলেন, তাহারই সফলতায় অদ্য এই অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। জীবনের এক এক যুগে এক একটি ঘটনায় মনুষ্য হৃদয়ের সুখসম্মিলনে বিশ্বসংসারের সবই যেন আপনার হইয়া যায়। কত অভিনব বন্ধু লাভে আবার নব জীবন সঞ্চার হইয়া থাকে। বিবাহ সূত্রে যে আত্মীয়তা জন্মে, তাহা চির সুখকর স্নেহের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ!

ঠাকুর পরিবারে ভ্রাতার বিবাহকালে দেশে আর নূতন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, বরং বুদ্ধিমতী সহৃদয়া পিসিমাতারা এ কার্য্য অন্তরের সহিত অনুমোদনই করিয়াছিলেন ও সুশীলা সুলক্ষণা ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ দেখিয়া পরম পরিতুষ্টও হইয়াছিলেন। পয়মন্ত বধূর আগমনে আমাদিগের গৃহের সর্ব্বাংশে মঙ্গল হইয়াছে। পিতৃকুল "কন্যাগত", কিন্তু পিতৃদেব কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীকে স্বশ্রেণী এবং বারেন্দ্র সমাজে বিবাহ দিলে কতকটা পূর্ব্ব সম্বন্ধ রহিয়া যাইত, তিনি তাহা না করিয়া যখন আবার তাহাদিগকে রাঢ়ী শ্রেণীতে বিবাহ দিলেন, তখন দেশের সহিত সমাজিক সম্বন্ধটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরিবর্ত্তনশীল কালের গতির সঙ্গে ক্রমে পুরাতনের তিরোধান ও নূতনের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। কালক্রমে সকল বিষয়েই একটা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা কাহারো চেষ্টা সাপেক্ষ নহে। ক্রমশঃ সেই পূর্ব্বকার কঠোর জাত্যভিমানের নিয়ম সব অমনি অমনি শিথিল হইয়া আসিতেছে, সেইজন্য আশা করা যায় যে, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে বিলাত প্রত্যাগতদিগেরও আসন সমান ভাবে রক্ষিত হইবে। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ আর কখন উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পরিবেন না। সমাজের অশেষ দুর্গতি যাহাতে তিরোহিত হয়, এক্ষণে তাহাই করা কর্ত্তব্য। কাপ কুলীন রাঢী বারেন্দ্র ব্যবধান দূর করিয়া সকলে একত্রে মিলিয়া স্বদেশের হিতকল্পে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেই জাতীয় মঙ্গল। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" থাকিলে চলিবে না, সকলে এক হইয়া মাতৃপূজা করিতে হইবে।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"—এই মহামন্ত্র জীবনে কখন যেন বিস্মৃত না হই।

দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পরিভ্রমণে যুবকের পূর্ণতর স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার উপর পিতৃদেবের ত বয়সও হইয়াছিল এবং একেবারে অনবকাশে নীরোগ শরীর হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ও রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখনও কার্য্য জীবনের মেয়াদ ফুরায় নাই, কিন্তু ইহলোকের দিন অকালে ফুরাইয়া আসিয়াছিল! তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা সে স্নেহ, মায়া, মমতা ও নিরাপদ আশ্রয় চিরদিনের জন্ত হারাইলাম, আর কোথায় পাইব? তিনি একাধারে জনক জননী ও ক্ষমাশীল যথার্থ বন্ধু ছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট যেমন অনুতাপে সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, তেমনি সে পার্থিব দেবতার কাছে আমাদিগের এক বিন্দু সরল অশ্রুজলে "সাত খুন মাপ" হইয়া যাইত। তাহার অভাব এ জীবনে কিছুতেই মোচন হইবার নহে। যাহা গিয়াছে, তাহা এ সংসারে কখনও পাইব না। তাঁহার জীবনব্যাপী স্নেহঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কাহারো নাই। তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ও স্বাধীন উদার ভাবের কণামাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেও এ জীবনের কতক সার্থকতা হইতে পারে।

"কল্পনা গিয়াছে থামি
কবিতার প্রস্রবণ বহে না অন্তরে,
গীতধ্বনি সুখ আশা,
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা,
কিছু আর দেখি না সংসারে,

মমতা আলয় শূন্ত,
কিছু নাই, স্মৃতি আছে হৃদয় মাঝার,
ব্যবধান প্রাণে প্রাণে,
স্নেহের বন্ধন হীনে,
দূরতায় শোভে না সংসার।

মহান সত্যের জ্যোতি,
করুণায় দ্রবীভূত হিয়া, দয়াময়
কৃপাসিন্ধু মূর্ত্তিমান,
স্নেহ বিগলিত প্রাণ,
প্রীতিভাবে মগ্ন সমুদয়।

তব অন্তর্ধানে দেব
জগতের সব যেন সমাপ্ত এখন,
অশ্রুসিক্ত মর্ম্মতলে,
শুধু ক্রন্দন উথলে,
স্মৃতি কহে তোমারি বচন।

তব পদচিহ্ন শিরে
তোমারি আদর্শ দেব মানস নয়নে,
তোমারি স্নেহের ভাতি,
দেখাইছে দিবা রাতি,
কর্ত্তব্যের পথ এ অদিনে।

ব্রহ্মাণ্ডের সার পিতা,
জননী রূপিণী মায়া, বিপত্তি সহায়ে,
লভিয়া অমরধাম,
চিরতরে ভাগ্যবান,
তুমি দেব শান্তির নিলয়ে।

"সমাপ্তি" সুখের দিন,
আনন্দের ঐক্যতান প্রাণের দুয়ারে,
বাজে না মধুর রবে,
আর দেখিব না ভবে,
জীবনের স্নেহ মূলাধারে।"

নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ।

মনুষ্য জীবনের কথা অফুরন্ত, তাহাতে আবার "পূর্ব্বকথা", তাহা যদি শুনিবার ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে ত "সোণায় সোহাগা" হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই বয়সে কথা আরম্ভ করিলে থামা শক্ত, আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষ ও মাতৃগণের আশীর্ব্বাদে ইহা যে কতক নির্ব্বিঘ্নে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম, এই পরম সৌভাগ্য মনে করি এবং মাতৃদেবী ইহাতে যে সুখানুভব করিবেন, তাহাই আমার সার্থকতা।

জন্মদিনে পূর্ব্বকথা সমাপ্ত

(১৪ই আশ্বিন)

"বধূগণ" শুন শুন, তোমাদের কহি পুনঃ
অতীতের দু'চারিটা কথা,
আজি নাকি জন্মতিথি, উপহারে চির ইতি,
দাবিহীন জীবন সর্ব্বথা।
ষষ্ঠী কল্পে মহামায়া, ভক্তগণে পদ ছায়া
আসে দিতে সেবকের তরে,
আশ্বিনে তাহারি সাথে, তাঁরি পদরজ মাথে,
আসিয়াছি জনকের ঘরে।
বোধনের আয়োজন, ঘরে ঘরে আবাহন,
বিল্বমূলে ঘটে অধিষ্ঠান,
ঢাক ঢোল বাজে কাড়া, দিকে দিকে পড়ে সাড়া,
বর্ষ পরে জাগাইয়া প্রাণ।
শঙ্খ, ঘণ্টা, বাজে বাঁশী, বাদ্য কর সুখে হাসি,
ধূপ ধূনা সমীরে ছড়ায়,
ধনী দীন সর্ব্বজনে, পরিতৃপ্ত ফুল্ল মনে,
নব বস্ত্র অঙ্গে শোভা পায়।
আনন্দের কলরব, শরতের মহোৎসব,
আনন্দে আনন্দময়ী আসে,
দেবী পূজা মহা হর্ষ, সেই যেন নব বর্ষ,
চারি ধারে হাসির উল্লাসে।
এই দিনে জন্ম মোর, ঠিকুজী কোষ্ঠীর জোর
বড় ছিল ভাগ্যের লিখনে,
দৈবজ্ঞ কহেন মায়, "সর্ব্ব সুলক্ষণা" তায়
কন্যার আকৃতি দরশনে,
"বৈধব্য ললাটে নাই, ধনে পুত্রে পূর্ণ ঠাঁই,
যেথা যাবে তোমার দুহিতা,"
জননী ভাবেন মনে, পাইলেন "শুভক্ষণে
হেন কন্যা তুলনা রহিতা।"
"বারভূঁয়ে" মাতামহ ষষ্ঠী পূজা সমারোহ
তাঁর ঘরে, বর্ণনা অতীত,
অকাতরে অন্নদান, সোণা-দানা ধাত্রী পান,
কুটুম্বিনী গৃহে উপনীত।

পিত্রালয়ে নয় মাসে, উৎসবের মহোল্লাসে
"অন্নারম্ভ" হইল যখন,
কত বাদ্য, কত ভাণ্ড, কত ধূম, কত কাণ্ড,
সে, যে, সব কাহিনী মতন।
অঙ্গ ভরা অলঙ্কার, সহিতে তাহার ভার
ভূমি নাহি ঠেকে কভু পায়,
জনকের স্নেহ প্রীতি, পরিপূর্ণ নিতি নিতি
ক্ষয় বৃদ্ধি নাহিক তাঁহায়।
সে মমতা কহিবারে, বচনে বচন হারে,
কার সনে তুলনা কাহার!
সাত ভাই, দিদি বড়, কর্ত্তামীতে সদা দড়,
বাল্য সুখ এমন কাহার?
পিতামহ কালীকান্ত, ক্ষমাশীল শান্ত দান্ত,
"সোণাবাজু" বাহু শোভা ধরে,
তাঁহারি ঘরের মেয়ে, নবগুণ হাতে পেয়ে,
গৌরীদান জ্যেষ্ঠতাত করে।
শনি দৃষ্টি হলাহলে, অদৃষ্টের ফলাফলে
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য হয়ে যায়,
চির বৈধব্যের নিশি, নবীন প্রণয়ে মিশি
উড়ে গেল স্বপনের প্রায়,
যৌবন জোয়ার লাগি অনুরাগ আর জাগি
উঠিল না হৃদয় বেলায়।
কল্পনায় মূর্ত্তি গড়া ভাঙ্গা নাহি লাগে জোড়া,
কাঠাম না হলে কদাচন,
দেবতা গড়িতে হলে, প্রেম চাহি হৃদি তলে
শূন্যতায় হয় না বরণ।
আদিতে হইলে ভুল, থাকেনা কাহার মূল,
হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি সার,
ঘটিলে ভাগ্যের দোষ, দেবতার বাড়ে রোষ,
মানবের কথা কিবা আর?
লক্ষ্মী বাম, অলকায়, পুঁজিপাটা নিয়ে যায়,
ধরিলাম বাণীর চরণ,
নব ফুল দুর্ব্বাদলে, অর্চ্চনা করিব বলে
কত অর্ঘ করিনু রচন,

যা কভু ছুঁলে না পায়, সে কুসুম মালিকায়,
যতনের কাব্য-গ্রন্থ মম,
কীটে কাটি ছারখার, কর্পূরে রহে না আর,
বিপণির জঞ্জালের সম।
তার পর জান সব, কি আর কহিব নব?
জীবনের সর্ব্বস্বান্ত কথা,
হৃদয়ের কতখানি, শূন্য তা'ত আমি জানি,
কত শোক, কত মর্ম্ম ব্যথা,
বিশ্বময় স্নেহ দিয়া যাহারে বাঁধিতে হিয়া,
চেয়েছিল আপনারে করি,
স্বপ্ন হলো তাও এবে, দিন গণা স্বধু ভবে
জন্মান্তের কর্ম্মফল স্মরি।
এসেছিনু যাহা লয়ে, সেও গেল বৃথা হয়ে,
কৃষ্ণ কেশ তুহিন ধবল,
এখন কাঁদিয়া খুন, বয়সে লেগেছে ঘুন,
স্মৃতিটুকু ভবের সম্বল।
বকে বকে মিছে মরি, দিন গেল হরি হরি
বয়সের স্বধর্ম্ম কেবল।
ঠাকুরঝির হাল চাল, বধূগণ জান ভাল,
তবু স্বধাইতে পার বোন,
"পূর্ব্বকথা" এত কেন, আবার তুলেছি হেন,
জননীর কাণ্ডখানা শোন,
পোড়া জন্মদিন আজ, মায়ের নাহিক কাজ,
আশীর্ব্বাদ, "চিরজীবী" হতে,
ভয়ে ভীত হয়ে তাই, তোদের ক'হেছি ভাই,
অবসর চাহি কোন মতে।

পূর্ব্ব কথার পরিশিষ্ট

আবার।

মনুষ্য জীবনের অতীত কাহিনী পূর্ব্ব কথা অফুরন্ত, তাহার উপর যদি আবার স্মরণশক্তিটা একটু বেশী রকমের হয় ও গত স্মৃতি সুখময় থাকে, তাহা হইলে তো সোণায় সোহাগা। পূর্ব্ব কথা পরিসমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা বলিতে বসিয়াছি কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, বয়সদোষ। এ বয়সে এক কথা তুলিলে আর ছাড়া যায় না, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই আসিয়া পড়ে। গত দিনের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক বড় কম, যাহা গিয়াছে, তাহা ভালই হউক, কি মন্দই হউক, আজ সে জন্য ত ভুগিতে হইতেছে না, কাজেই সুখেরই বলিতে হয়। আমাদের বাল্যকালের সহিত আজ কালিকার মেলিনস্ ফুড এবং হরলিক্ সেবিত বাল্যকালের অনেক প্রভেদ। আমরা যখন ছোট ছিলাম, অর্থাৎ যতদিনের কথা মনে আছে, তাহার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন দিকেই মিল নাই। রোগ পীড়াও সব ভিন্ন ভিন্ন। টনসিল্ বলিয়া রোগটী আমরা কখন সেকালে দেখি নাই, আর এখন ঘরে ঘরে বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারীরাও ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া কত কষ্ট ভোগ করে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের জ্যেষ্ঠতাত খুল্লতাতদিগের পুত্রকন্যাদের সহিত একত্র প্রতিপালিত হইয়াছি। পিসিমা জ্যেঠিমারাই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমগ্র পরিবারের সুখ, দুঃখ, সেবা শুশ্রূষা নির্ভর। আমার জননী এবং খুড়িমাতারা তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া পারিবারিক সকল কার্য্যেই যোগ দিতেন, তবে পশ্চাৎ হইতে গুরুজনের আজ্ঞা পালন করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। আমরা সকলে মিলিয়া দশবারটী বালক বালিকা গৃহে ছিলাম। তাহার মধ্যে পিসিমাতার নাতি নাতিনীও ছিল। একই নিয়মে সবাইকে এক পথে চলিতে হইত। গৃহের সকল বালক বালিকাই যে শান্ত সুস্থির ছিল, এমন নহে। "দুষ্টের দমন আর মহতের হিত, এই তার কুলধর্ম্ম জগতে বিদিত।" এইটী গৃহিণীরা মনে রাখিয়া সমান-ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেন। আমার স্বর্ণদিদি (জ্যেষ্ঠতাত কন্যা) যেমন ভাল ছিলেন, তাঁহার ছোট দাদা কালীপ্রসন্ন চৌধুরী আবার তেমনি দুর্দ্দান্ত ও দুরন্ত বালক থাকায় তাঁহাকে নরমে গরমে চালাইতে হইত। "অনুরাগে তিনি কেনা" ছিলেন, শাসনের কেনা নহেন।

আমরা রাত্রি প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই রাত্রিবাস ছোট ধুতি শাড়ী (বচকণা) ছাড়িয়া পরিশুদ্ধ ধৌত বস্ত্র পরিয়া ঠাকুর পূজার ফুলদূর্ব্বা আনিবার জন্য সাজি হাতে বাগানে বাগানে ভ্রমণ করিয়া তাহা আনিতাম।

নিজের কি অন্যের বাগান ভিন্ন ছিল না, সকল সমান, দেবপূজার ফুল সর্ব্বত্র তুলিবার অধিকার ছিল, বিশেষতঃ কুমারী কন্যাগণ সকলের নিকট ভগবতীর অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই পুষ্প আহরণের সময় বোনে বোনে সখীতে সখীতে ভাব অভাব ঝগড়া যে হইত না, এমন নহে, তবে বাড়ী আসিয়াই সে সব মিটিয়া যাইত, ও প্রত্যেকের সাজি জ্যেঠিমাকে বুঝাইয়া দিতে হইত। তিনি পূজার আয়োজন করিতেন এবং অতিশয় নিষ্ঠাবতী ছিলেন। পুষ্পচয়নে আমি তেমন দক্ষ ছিলাম না। আমাদের বড় তরফের স্বর্ণদিদি ও ছোট তরফের কুমুদিনী দিদি (মধ্যম জ্যাঠামহাশয়ের কন্যা) সর্ব্বকাজেই বিশেষরূপে পারদর্শিনী ছিলেন। জ্যেঠিমা আমার, পুষ্প পাত্রে শাদা লাল নীল বিবিধ বর্ণ ফুল যখন সাজাইয়া রাখিতেন, তাহা দেখিয়া নয়ন যেন জুড়াইয়া যাইত। "এমন পবিত্র, এমন কোমল দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল ?" বেলা প্রহরাতীত হইলে তিনিই আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন, আমরা প্রাতঃকালে গরম গরম দেশী আতপ চাউলের ফ্যান্‌সা ভাত যতরূপ সিদ্ধ পোড়া গৃহজাত গব্য ঘৃতসহ খাইয়া পাড়ায় কাহারো না কাহারো বাড়ী খেলিতে যাইতাম। সে খেলাও এ যুগের সঙ্গে একেবারে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ রামরাবণের যুদ্ধ তীর্থযাত্রা গঙ্গাস্নান এবং সাংসারিক দশকর্ম্মের অভিনয়। আড়াই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ তল্লাস থাকিত না ; তখন গৃহিণীরা ও বধূগণ দৈনিক গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। আমাদের গ্রামে ভাঁড়ার বাহিরে ভাণ্ডারীর হাতে গোলায় থাকার নিয়ম। সেই সকালে আসিয়া লোক গণিয়া সকল দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করিত। তরকারী, পিসিমাতারা কুটিয়া দিতেন, দাসীগণ রন্ধনশালার কার্য্য করিত। সেকালে বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে কর্ত্তারা আহার করিতেন না। যত বড়ই ধনী জমিদার গৃহিণী হউক না কেন, তাঁহাকে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজনের জন্য দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত। বিবাহিতা কন্যাগণ পিত্রালয়ে থাকাকালীন পিতা পিতামহদিগকে পরিবেশন করিত। তখন কুটুম্ব ছাড়া গৃহই ছিল না। প্রত্যহ দেবসেবা, বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রত, নিময়, ব্রাহ্মণ ভোজন লাগিয়াই থাকিত। ঠাকুর ভোগ বিধবারা রাঁধিতেন।

সেখানে বৈবাহিক, জামাতা ও শ্যালক প্রভৃতির সম্মুখে বধূগণের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না ; এখনও সে অঞ্চলে এ প্রথার অন্যথা হয় নাই। পরিহাসের সম্পর্ক হইলেও বধূগণ প্রত্যক্ষভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। ছোট ছোট দেবর ননদ অন্য বালক বালিকা কিংবা বৃদ্ধা দাসীর দ্বারা ঠাট্টা তামাসার উপকরণ প্রেরণ করিতেন। দুই বার যখন কর্ত্তাদিগের সঙ্গে অন্তঃপুরে তাঁহারা আহার করিতে আসিতেন, তখন ন্যাকড়ার ফুলুড়ী ও চাউলগুঁড়ির দুধ পাঠাইয়া দিতেন ও জামাতারা ঠকিয়া গেলে খুব একটা হাসি পড়িয়া যাইত। "অজ্ঞাত কুলশীলে"রা পুরমধ্যে যাইতে পারিতেন না, সেটা বংশপরম্পরায় আজও দেশে

চলিয়া আসিতেছে। অদ্যকার জগন্নাথ ক্ষেত্র, সেকালে কুত্রাপি দেখা যাইত না। মহাপ্রসাদের ছড়াছড়িও এমন ছিল না। নিত্য নৈমিত্তিক গৃহ কার্য্য সম্পন্ন হইলেই গৃহিণীরা আমাদিগকে স্নানার্থে ডাকিয়া আনিতেন। পিসিমাতা কি জ্যেঠিমাই আমাদের গাত্রে প্রচুর সরিষার তৈল মাখাইয়া ও গৃহজাত নারিকেল তৈলে কেশ রঞ্জিত করিয়া এক একখানি গামছা ও ছোট ছোট কলসী কিংবা বড় তামার ঘটী হস্তে দিয়া দীঘি কি পুষ্করিণীতে স্নানার্থে লইয়া যাইতেন। গাত্র মার্জ্জনা তাঁহারাই করিয়া দিতেন, এক একজনের অবগাহন স্নান সমাপ্ত হইলে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া সিক্ত শাড়ী শিরোপরি আচ্ছাদন স্বরূপ দিয়া জলপূর্ণ কলসী কক্ষে তুলিয়া দিতেন ও সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিতেন। ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম কখনও হইতে পারিত না। এ মিলিটারী অর্ডারের ন্যায় নীরবে মানিয়া চলিতে হইত, নতুবা কোর্ট মার্শেলের ভয় ছিল।

স্নানান্তে আমরা মেয়েরা জলযোগের আয়োজন করিতে চণ্ডীমণ্ডপে যাইতাম, কেহ ফল কাটিতাম, কেহ রেকাবী সাজাইতাম, কেহ বা ভৃত্যগণকে চিড়াগুড় ভাগ করিয়া দিতাম। বালকেরা ফল খাইয়া কাছারীতে হাতের লেখা শিখিতে যাইত। মদন মৈত্র নামে আমাদের এক পুরাতন আমলার হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষরের ন্যায় ছিল, এজন্য তিনি ঐ কার্য্য করিতেন। আমরা বুড়া দাস দাসী আমলাবর্গকে, দাদা, দিদি, কাকা, জ্যেঠা বলিয়া ডাকিতাম, নাম ধরিতাম না, ছোটদের মালের বেটা, কিম্বা দাসের বেটা বলিতাম। তাহারা আমাদের আত্মীয়বৎ ছিল। একালের আধাবয়সী চাকর "ছোকরা" "Boy" নামে অভিহিত। গাঁই গোত্র পিতামাতার নাম লুপ্ত। শুনিয়াছি, "মৈত্রদাদা" বড় সুরসিক ও জামাই, বেয়াই, শ্যালক বাবুদিগকে ক্ষেপাইতে খুব দক্ষ ছিলেন। কোন বৈবাহিক যদি অহিফেন সেবী হইতেন, তাঁহার পুত্র জামাতা বাবাজীকে কৌতুকচ্ছলে তাড়াতাড়ি মিছরির সরবৎ দিতে ভাণ্ডারীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেন, "এত বেলা হইয়াছে এখনও সান্যাল কি লাহিড়ী মহাশয়কে সরবৎ দিস্‌নি? আফিমে নাড়ীর ছেলে, যদি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়াই যায়, তখন ব্রহ্মহত্যা হইবে যে।" এক কুলীন জামাইবাবুর গালে কি একটা বড় কাল দাগ ছিল, তাহাতে মদন দাদা গম্ভীরভাবে ছোট কর্ত্তাকে বলিয়াছিলেন, "এ বড় ভাগ্যিবন্ত ছেলে, গালে লক্ষ্মীর পারা আছে।" একেবারে দোলযাত্রার সময় যাত্রার গানে ঘর জামাই সং দেওয়াইয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়াছিলেন।

বালকগণ আগে মাটীতে, পরে তালপত্রে এবং পরিশেষে বালির কাগজে লেখা শিখিত। শত দুর্গা, কালী নাম লিখিয়া হস্ত পাকাইয়া শেষে অন্য কথা লিখিতে হইত। চিঠি পত্র যাহাই লেখনা কেন, পূর্ব্বে দেব দেবীর নাম লিখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার নিয়ম ছিল। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথা থাকায় শাক্তের ছেলে দুর্গা কালী শিব গণেশকে এবং বৈষ্ণবের ছেলে শ্রীহরি

শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া কাগজের শিরোদেশে নিজ নিজ গৃহদেবতার নাম লিখিত।

বিবিধ

মধ্যাহ্নে আমাদের আহার পরিবেশন শিখিতে হইত, ছোট ছোট থালায় অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া ভৃত্যগণকে পরিবেশন করিয়া দিতাম। কাজটী শ্রমসাধ্য ও একটু বিবেচনা সাপেক্ষ। সকল দ্রব্য সমান ভাগে পাত্রে পাত্রে দিলে তবে সকলেই তুল্যরূপে পায়, নতুবা কাহাকেও বেশী এবং কাহাকেও কম দিয়া ফেলিলে অনর্থ বাধিয়া যায়। গৃহকার্য্য রীতিমত তখন যাহা শিখিয়াছিলাম চির প্রবাসে থাকিয়া তাহার আর কোনও সার্থকতা হয় নাই, বরং অনভ্যাসে এখন সমুদয় একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি।

সায়াহ্নে আমাদিগের ছোট তরফের পিতৃষসা কৃষ্ণসুন্দরী দেবীর গৃহে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হইত। আমরা তাহা শুনিতে নিত্য যাইতাম, সেইখানেই কেশবন্ধন চলিত, জেঠিমা পিসিমারা সেইখানেই উপস্থিত থাকিতেন ও আমাদিগের শিরে আবার তেল দিয়া কেশ রচনা করিয়া দিতেন, ইংরাজী "বাণ-খোপার" ন্যায় আমাদিগের খোপা বাঁধিবার নিয়ম ও কপালের উপর সকলেরই "থর" কাটা ছিল।

গ্রামে কাশীশ্বরী নাম্নী এক বাল বিধবা ছিলেন, তাঁহার ইহসংসারে আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রামের সকলে তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন; আপদ বিপদে রোগ শোকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে লোকে ডাকিতেন। রোগীর শয্যার পার্শ্বে অতিথি অভ্যাগতের জন্য রন্ধনশালায়, পূর্ব্বে তাঁহাকেই দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা বালবিধবা হইয়াও শোকাকুলা বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন, পুত্রবিয়োগবিধুরা মাতার প্রাণে শান্তি দিতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেখানে পড়িয়া থাকিতেন। কাশীশ্বরী মন্ত্রদাতা ইষ্ট গুরুদেবের নিকট দিব্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

"গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিণী" "রামায়ণ" "মহাভারত" "বৈষ্ণব পদাবলী" "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, ঐ সকল যখন সুর করিয়া ভক্তিভরে দুলিয়া দুলিয়া অধ্যয়ন করিতেন, আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া অনন্য মনে বসিয়া তাহা শুনিতাম। কখনও বা চক্ষুর জলে বস্ত্রাঞ্চল ভিজিয়া যাইত। সেই গত কালের দৈনিক পাঠ শ্রবণের উপকারিতা এই পর জীবনে অনুভব করিয়া এখন বুঝিতে পারি যে তাহাতে কি মহৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি পাঠক, আর আমরা গ্রামশুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ বনিতা শ্রোতা। সেই মধুর কণ্ঠ, সেই ভক্তিগদ্গদ ভাব এখনও ভুলিতে পারি নাই; তাঁহার মুখে যে সমুদয় রামায়ণ মহাভারতের

অমৃত কাহিনী শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার পর নিজে পড়িয়া নূতন কিছু শিখি নাই, পূর্ব্বের পাঠ পুনরাবৃত্তি করিয়াছি মাত্র।

আমাদের গ্রামের অধিকাংশ রমণী তৎকালেও লেখাপড়া জানিতেন। ছাপার পুস্তক পাঠ ও নাম স্বাক্ষর করিতে না পারিতেন, এমন নারী সেকালে অল্পই ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রীতিমত লেখাপড়া জানিতেন, কেহবা কাজ চালাইতে পারিতেন, এই যাহা প্রভেদ। আমার মধ্যম পিতৃস্বসা ৺ভগবতী দেবী ছোট তরফের ৺কৃষ্ণসুন্দরী দেবী ও নপিসিমাতা মৃন্ময়ী দেবী বেশ লিখিতে পড়িতে পারিতেন, তবে কাশীশ্বরী সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিতা, ছোট ছোট বালক বালিকাগণ তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতে যাইত। অসহায় বালবিধবার রূপ বড় বিপদজনক, আত্মসম্মান রক্ষার্থে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। শ্যামাঙ্গিনী কাশীশ্বরী যৌবনে অতিশয় সুরূপা ছিলেন, সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, আয়ত লোচন ও সুঠাম, দীর্ঘ, পূর্ণ দেহ যষ্টি, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এজন্য তাঁহার একাকিনী পথ ঘাটে চলা ফেরা নিরাপদ না থাকায় তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এক নিশীথ রাত্রে পুরাতন বৃদ্ধা পরিচারিকা সহ জেলা কোর্টের জজ সাহেবের নিকট আশ্রয় ভিক্ষার আবেদন পত্রসহ যাইয়া উপস্থিত হন, তৎকালে তিন মাস পরে দায়রার বিচারার্থ জজ মহোদয় পাবনা আসিতেন, ইহার মধ্যে অন্য সকল কাজ কর্ম্ম রাজসাহীতেই হইত, ব্রহ্মবাদিনী অরুন্ধতীর ন্যায় তেজস্বিনী ব্রাহ্মণ কন্যাকে একাকী বিচারালয়ে দেখিয়া ও তাঁহার বিপন্নাবস্থার কাহিনী শ্রবণে দয়ালু জজ সাহেব এক "জরুরি পরোয়ানা" গ্রামে পাঠাইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে "এই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি কখন যদি কোনও রূপ অত্যাচার শুনিতে পান, তাহা হইলে বিনা বিচারে দোষীদিগকে ছয় মাসের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবেন।" জজ সাহেব সরকার হইতে দুঃখিনী বিধবাকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে কাশীশ্বরী তীর্থ ভ্রমণ করিয়া "হঠি তর্কালঙ্কার" সাজিয়া মুণ্ডিত মস্তকে সগৌরবে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া এক পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন, সেখানে পল্লী বালকবালিকারা অনেকেই অধ্যয়ন করিত, সে সময় তিনি আর কোন বাড়ীতে পড়িয়া শুনাইতে যাইতেন না, তাঁহার গৃহে প্রত্যহ পাঠসভা বসিত, আমরা নিয়মমত তথায় যাতায়াত করিতাম, তাঁহার পাঠশালায় পড়িতাম না। বৃদ্ধকালে কাশীশ্বরী ঠাকুরাণী এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়ন দিয়া ভিক্ষাপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের যথার্থস্ব দান করিয়াছিলেন। বালবিধবা হইয়াও তাঁহার হৃদয় পবিত্র মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ ছিল।

আমার মাতামহালয়ে হাতে খড়ি ও চূড়াকরণ হইয়াছিল। মাতার এক অতি বৃদ্ধ ও টুকটুকে পক্ক আম্রবৎ বেলমাথা ঠাকুরদাদার নিকট লেখা শিখিতাম। তিনি বধির ছিলেন ও তাঁহার এক অতীব প্রিয়তম সুদর্শন দিব্যকান্তি দৌহিত্র 'কৃষ্ণকে' উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, "একটা ক লেখত, একটা খ লেখত", তাহাতেই

আমাদের সুবিধা হইয়া যাইত। অক্ষর পরিচয়, মুখস্থ ও লেখা এক সঙ্গে শিক্ষা হইয়াছিল। দেবদেবীর শত নাম, পিতৃমাতৃবংশের সাতপুরুষের "নাম শ্লোক" সন্ধ্যার সহিত কুলপুরোহিতের কাছে শিখিয়া ও মুখস্থ বলিয়া সে দিনের সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যাইত এবং তাহার পর শয়নের পূর্ব্বে শীতকাল হইলে অগ্নি-কুণ্ডের চারিপার্শ্বে ও গ্রীষ্ম হইলে প্রাঙ্গণে বসিয়া বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যগণের প্রমুখ্যাৎ "আরব্য উপন্যাস", "গোলেবাকালী" ও "বিজয়বসন্ত" ও নানাপ্রকার গ্রাম্য রূপকথা শুনিয়া পিতৃষসাদিগের সহিত শয়ন করিতে যাইতাম। তখন আবার শয্যার উপর যুক্তকরে বসিয়া দুর্গা কালী শিব রাধাকৃষ্ণ এবং প্রধান প্রধান তীর্থ গয়া কাশী ও নদ নদীর নাম গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বলিয়া শয়ন করিতাম। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাহাই করি না কেন, সকল কার্য্যেই ভগবানকে স্মরণ করিতে হইত। প্রভাতে জীবন আরম্ভ, এবং নিশীথে কার্য্য শেষ তাঁহার নামেই করিবার নিয়ম ছিল। সেকালে বালক বিশেষতঃ বালিকাগণ অমনি বৃথা মাংস খাইতে পাইত না। পূজার বলিদানের ছাগমাংস দেবীর প্রসাদস্বরূপ পূজার সময় ছেলেরা ভক্ষণ করিত, তাহাতে পলাণ্ডু দেওয়া হইত না, সে মহামায়ার ভোগের এক উপাদেয় রন্ধন, তাহা সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে কখনও হয় না। ভোগের সে প্রসাদ যদিও কোন কুমারী কন্যা মাতার অনুমতি লইয়া খাইতেন, বিবাহ পরে শ্বশুরালয়ে কর্ণে মন্ত্র দেওয়া হইলে শাক্ত কন্যা কি বধূ আর কখন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিতেন না, স্ব-ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিতেন। গৃহিণীরা মনে করিতেন, মাতা মাংস ভোজন করিলে তাহার গর্ভজাত সন্তান রাক্ষস হয়। সেই ভয়েই শৈশবকাল হইতে মাংস নারীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ, এক্ষণে আমরা দেশের পূর্ব্বকালীন আদর্শ হারাইতে বসিয়াছি ও অন্য-দেশের ভাল কিছু গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, ইহা আরও দুঃখের বিষয়।

সে কালে খাঁটী দুগ্ধ, সর, ছানা, ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। আমাদের গৃহে দৈনিক যোগান দুগ্ধ টাকায় ত্রিশ সের আসিত ও রাত্রে কর্ত্তা হইতে রাখাল পর্য্যন্ত তাহা অতি তৃপ্তিসহ খাইতে পাইত, মাপ করিয়া কাহারো বাটীতে দিবার প্রয়োজন হইত না। নারিকেলমালা কঞ্চি বাঁশের সহিত হাতার ন্যায় তৈয়ারী "ওড়ং" নামক পদার্থে সেই কার্য্য হইত। টাকায় চারি সের "জলবৎ তরলং" দুগ্ধ সন্তর্পণে ভাগ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না।

সেকালে আমার মাতুলালয়ে দুগ্ধ জালের এক পৃথক ঘর ও দাসী ছিল, তাহার প্রতিদিনের কার্য্য দুগ্ধ জাল দেওয়া, ক্ষীর, সর, ছানা ও দধি প্রস্তুত করা। কর্ত্তা বাবু ও ছেলেরা, কন্যা গৃহিণীগণ দুইবার দুগ্ধ সেবন করিতে পাইতেন। রাত্রে একবার দাস দাসীরা সকলেও সেই সঙ্গে পাইত। এখন যেমন কেবল দুগ্ধ চুরি শুনিতে পাই, তখন এরূপ শুনিতাম না। পরিচারক ও পরিচারিকা-দিগের উপর ঐ সকল কাজের ভার যেমন ছিল, তাহারাও সুচারুরূপে তাহা

নির্ব্বাহ করিয়া প্রভুপত্নীর বিশ্বাসভাজন থাকিয়া আমরণ একাই প্রভুর গৃহে জীবন অতিবাহিত করিত। পূর্ব্বে বাগের রায় মহাশয় (আমার মাতমহ) গণের গৃহে সব ক্রীতদাস ও দাসী থাকিত। দশ বার কাহন কড়িতে ক্রয় বিক্রয় চলিত, টাকা পয়সা সাধারণ লোকে বড় বুঝিত না ; হাট বাজার ঐ কড়ি দ্বারা হইত। বড় বড় কার্য্যে — উপনয়ন, দুর্গোৎসব, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি ব্যাপারে — টাকা পয়সার খরচ দেখা যাইত।

শৈশবে আমরা পল্লীগ্রামের স্বচ্ছ নীল আকাশের নিম্নে মুক্ত বায়ুতে প্রকৃতি-মাতার অবারিত স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে সকল দিন পড়িয়া ধূলিকর্দ্দম খেলায় মানুষ, সহরের রুদ্ধ বায়ু, প্রাঙ্গণহীন গৃহ, রাজপথ পার্শ্বের গাড়ী ট্রাম চলার বিরাট শব্দের মধ্যে যে সকল বালক বালিকা পরিবর্দ্ধিত, তাহাদের স্বাস্থ্য আর আমাদের স্বাস্থ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। নিদাঘ রৌদ্র, বর্ষার বারিধারা তখনকার বালক বালিকার ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল, তাহাতে কোন পীড়া হইত না। বর্ষার বৃষ্টিজলে যে স্নান করে নাই, তাহার শৈশব কৈশোর বৃথায় গিয়াছে। বৃষ্টিজলে ভিজিয়া শিল কুড়াইয়া তাহার দ্বারা মোয়া প্রস্তুত করিয়া গোলা ছোঁড়াছুঁড়ী খেলায় যে জিতিয়া যাইত, সেদিন দলের সর্দ্দার গণ্য হইয়া সে বৃদ্ধগণের নিকট হার জিতে পুরস্কার পাইত। আহার বিহার, চলা ফেরা সকল বিষয়ে এখন যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্যও দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেশব্যাপী দারুণ ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে রক্ষা পাইয়া যে কয়দিন বাঁচা যায়, সেই সৌভাগ্য। আগেকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মহামারীর গল্পও একটা ইতিহাস বিশেষ। বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনের প্রমুখাৎ তাহার কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা কত বৎসর অন্তর দুই একবার ঘটিত ; আর এখনকার ভয়াবহ রোগ ডিপ্‌থিরিয়া টন্‌সিলাইটিস, এপেণ্ডেসাইটীস, ম্যারিণজাইটিস প্রভৃতির চিরবাসস্থান গৃহস্থের পুত্রকন্যার শরীরে ও ধনবানের গৃহে কায়েমি বন্দোবস্ত হইয়াছে। আজকালের পিতামাতার প্রতিদিনের জীবন সন্তানের স্বাস্থ্য লইয়া অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল রোগ বিদেশী আমদানী, কালের পরিবর্ত্তনে সমস্ত অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে ; এই সকল নূতন নূতন ব্যাধি পীড়াও তাহারই অনিবার্য্য ফল। মিশ্রিত কৃত্রিম দুগ্ধ, ঘৃত ও টিনজাত অতি পুরাতন আহারীয় নানা রোগ আনয়ন করে।

মাস-মহাত্ম্য।

পূর্ব্বে বৎসরের তিন মাস কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ পুণ্য মাস বলিয়া গণ্য হইত। কার্ত্তিকে আকাশ প্রদীপ দেওয়া, যমপুকুর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, চণ্ডী-পাঠ, দান, মাঘে প্রাতস্নান, পুরাণ শ্রবণ, বস্ত্র বিতরণ, গৃহদেবতাকে পিঠা পরমান্ন খিচড়ী ভোগ দেওয়া প্রায় প্রতিগৃহে চলিত। বৈশাখ উৎসব মাস, সংক্রান্তি

হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ব্রতনিয়মের ধূম পড়িয়া যাইত। জলদান, ফলদান, নিত্য সুন্দরী (পুনর্জন্মে নিরুপমা সুন্দরী হইবার জন্ম) জন্ম এয়তিব্রত, দেবতাকে ভোগ, নারায়ণের মস্তকে ঝরণা এবং শাস্ত্রশ্রবণ ও শতনাম কীর্ত্তন হইত। দিনে গৃহিণীদিগের একেবারেই অবসর থাকিত না। সন্ধ্যাসমাগমে গৃহবিগ্রহের জন্ম গন্ধমাল্য রচনা করা এবং চণ্ডীমণ্ডপের দালান স্বহস্তে শীতল জলে ধুইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া শীতলপাটী বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন করিতেন ও সমাগত আত্মীয় স্বজন গুরু পুরোহিতদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক শীতলভোগ খাওয়াইয়া কৃতার্থ হইতেন। পরে দাসদাসী প্রভৃতিও প্রসাদ পাইয়া আহ্লাদিত মনে আবার প্রজাবর্গকে অন্তঃপুর বাহিরে খাওয়াইতে যাইত। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত এই সুখ সম্মিলন ও ভোজনের উৎসবে প্রাণ পূর্ণ থাকিত। আমরা বালকবালিকা সকলে মিলিয়া ঘরে ঘরে দেখিয়া বেড়াইতাম, এবং কাহার বাড়ীতে কিরূপ শীতলভোগ হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিতে ছাড়িতাম না। আষাঢ়মাসে আম কাঁটালের আদানপ্রদান এবং অনুগত জনের প্রাপ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইত। আম কাঁটাল রসসহ ক্ষীর, দধি, ঘোল, আওটান দুধের সম্মিলনে চিড়া খই দিয়া উপাদেয় আহারের একটা উৎসব ছিল। সেটা প্রায়ই বৈকালিক এবং মহিলাদিগের মধ্যে চলিত ছিল। ব্রাহ্মণদিগকেও আম খাওয়ান প্রথা ছিল। কেহ এক শত পক্ক আম্র এমং জলপানের পূর্ব্বে সের খানেক মিষ্টান্ন অনায়াসে সমাধা করিয়া রাত্রে আবার রীতিমত অন্নাহার করিতেন। গ্রামে সেই সকল চিহ্নিত ব্রাহ্মণেরা "মুনকে রঘু", "সেরকে ন ঠাকুর" প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিলেন। আহার গৌরবে পিতৃমাতৃদত্ত প্রকৃত নাম লোপ পাইয়াছিল।

তাহার পর সুখের আশ্বিন মাসে মহামায়ার আগমনে বঙ্গদেশের রোগশোকের দুঃখদৈন্যের যেন অবসান হইয়া যাইত। অনাথ আতুরও তিন দিনের জন্য আপন জীবনের অসীম অন্নকষ্টের কথা অনাহার ক্লেশ ভুলিয়া ধনীর দ্বারে সাদরে আহূত হইয়া প্রসাদ পাইত। দয়াবান গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়াও অকাতরে অন্ন বস্ত্র দানে দরিদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই তিন দিনে জাতি বিচার নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একই মাতৃ প্রসাদের অধিকারী। বৎসরে চারি পাঁচ মাস ধনীর দ্বার দরিদ্রের জন্য উন্মুক্ত থাকায় সেকালে এত অন্নকষ্টের হাহাকার ধ্বনি ছিল না, এক মুষ্টি অন্ন পল্লীর সর্ব্বত্র মিলিত। এখন সেই ধর্ম্মের শিথিলতায় আত্মসুখমুগ্ধতায় এত বাহুল্য ব্যয় আসিয়া পড়িয়াছে, যে নিতান্ত আপনার জনেরই বিপদে সাহায্য করা কষ্টকর কার্য্য।

মলচুরী।

সেকালে একালে এই উভয় কালেই পল্লীগ্রামের জমীদার গৃহে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হইলেই ভোজ ফলাহারের আয়োজনটা একটু বিশেষরূপে করিবার প্রথা

দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিনের কার্য্য হইলেও সেই সপ্তাহ পূর্ব্বে কুটুম্ব সমাগম, দেবকার্য্য, কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও মঠের শিবপূজা, বেহুলার জাগরণ (জাগর) গীত প্রভৃতি নিয়মমত হইয়া থাকে। ছোট বড় প্রত্যেক কাজেই প্রচুর পরিমাণে লোকজন নিমন্ত্রণ করার নিয়ম, তাহার উপর গ্রামের চতুর্দ্দিকের প্রজাগণ ত আছেই, দাসদাসী অনুগত এবং অভ্যাগত অতিথিগণ কাহাকেও বাদ দেওয়া যায় না, কাজেই খাওয়াইবার ব্যয় ও তাহার নিমিত্ত পরিশ্রমও বেশী হইয়া পড়ে। ছোট তরফের আমার মধ্যম জ্যাঠামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহিনী-চন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময়ও ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমার বয়স তখন দুই কি আড়াই, তথাপি একজন পুরাতন দাসী (চাঁদদিদি) আমার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, আমিও তাহার জিম্মায় সকল দিন থাকিতাম। সে যখন কোন কাজে বাধ্য হইয়া যাইত, তখন আমাকে কাছারী বাড়ীতে পাইক সর্দ্দার কিংবা কোন আমলার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিত। ছোট তরফ বড় তরফ এক বাড়ী, গৃহপ্রাচীর মাত্র ব্যবধান, তাহার কপাট খুলিলেই এক হইয়া যায়, তবে অকারণ দুয়ার মুক্ত করা হয় না, তাহাতে দাসদাসীতে সর্ব্বদাই কলহের ভয়। সেদিন মেজ জ্যাঠামহাশয়ের প্রথম পুত্রের ভাত, বাড়ী লোকে লোকারণ্য, কে কাহাকে দেখে। আমার গাত্রভরা অলঙ্কার, কাজেই চাঁদদিদি পিতার অনুগত পাচক মহেশঠাকুরের হস্তে আমাকে দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যায়। আমিও ঘুমাইয়া পড়িলে মহেশদাদা অন্তঃপুরে লইয়া আমাকে শয়ন করাইয়া নিকটে পাহারা থাকে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মায়ের কোনই অবকাশ না থাকায় তিনিও একবার আমার তত্ত্বতল্লাস করিতে পারেন নাই এবং আমিও তেমনি ঘুমাইতেছি। তাহার পর সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইবামাত্র মা আহার সামগ্রী লইয়া আমাকে খাওয়াইতে আসিয়া দেখেন, আমি গভীর নিদ্রায় সেই প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীতে একা পড়িয়া আছি, কাছে কেহই নাই, কতক্ষণ যে, অনাহারে রহিয়াছি, তাহারও কোনরূপ সংবাদ জানিবার উপায় না থাকায় তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে কোলে উঠাইয়া আহার করাইতে বসাইয়া দেখিতে পাইলেন, অন্য সকল গহনা আছে, কেবল পায়ের নূতন মল চারিগাছা নাই। তিনি প্রথমে মনে ভাবিলেন, হয়ত বিছানায় পড়িয়া আছে, পরে খুঁজিয়া না পাইয়া বাহির বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, তখন চারিদিকে গোলমাল, খোঁজ পড়িয়া গেল। চাকর দাসীর প্রাণান্ত উপস্থিত হইল ও জেরা সওয়াল জবাব সবই সমানভাবে চলিতে লাগিল, কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মলের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। মহেশদাদাকে কেহ সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত মনে করিলেন না। কত লোক গ্রামান্তর হইতে আসিয়াছিল, সামান্য মলের জন্য অত গণ্ডগোল না করাই ভাল ভাবিয়া পিতৃদেব নীরব হইয়া রহিলেন; কেবল আমার পিতৃষ্বসাঠাকুরাণীরা "সুরত হালের" জন্য চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, আমি পিতা-

মাতার প্রথম সন্তান, আমার গাত্রালঙ্কার চুরী যাওয়া অতীব অশুভলক্ষণ, তাহার উপর, লোকের এত বড় সাহস, যে ছোট কর্ত্তার কন্যার পায়ের মল দিনে দুপুরে চুরী এ কার্য্যের সমুচিত প্রতীকার না হইলে দিনেই ডাকাতি ও শিশুহত্যা প্রভৃতি হইবে, কঠোর শাসনের দ্বারা দাষীকে শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। পিসিমাদের এই ন্যায় সঙ্গত কথার কেহ আর উত্তর করিতে সাহস পাইলেন না, চোরের অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

আমার অতি বাল্যের কথা এখনও মনে আছে এবং মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তৎকালে আমার বয়স তিন বৎসর মাত্র। তবে এ মলচুরীর কোন কথাই আমার মনে নাই, বারংবার শুনিয়া এমনি হইয়া গিয়াছে, যে আমি যেন সবই জানি, প্রকৃত পক্ষে ইহা আমার নিকট রূপকথার ন্যায়, শুনা মাত্র। নয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশনের কোন গহনাই দুই আড়াই বৎসর বালক বালিকার গাত্রে কখনও হইতে পারে না, বিশেষতঃ মল ; কাজেই আমার মল আবার নূতন করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, হাতে বিছাবালা হিন্দুস্থানী গড়ন। আমাদের অধিকাংশ গহনাই সেকালে পশ্চিমে ও সাজ সজ্জাও সেইরূপ ছিল। টানিলে বাড়িয়া যাইত, ভিতরে কল থাকায় টানিয়া ছোট বড় করা যাইত, বাহিরের লোকে সেটা জানিত না, সেইজন্য বালা চুরী না হইয়া মলই গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে পল্লীময় মলের সমাচার প্রচার হইয়া সর্ব্বত্র "খানাতল্লাসী" হইয়াও সে বিষয়ে কোন কিছু আবিষ্কার হইল না, রাত্রিটা সকলেরই বড় অশান্তিতে কাটিয়া গেল।

পরদিন বেলা প্রহরাতীত হইলে পিতৃঠাকুর সদর কাছারীতে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন, মলের কথা তাঁহার মনেও ছিল না, এমন সময় আমাদের সাতপুরুষের খাসের প্রজা (সম্বৎসর গহনা প্রস্তুত করিয়া দিত, খাজনা দিতে হইত না) রামজয় পোদ্দার আসিয়া প্রণাম করিয়া যুক্ত করে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "হুজুর, মাসখানিক আগে এই "খাড়ে" (মল) আমি নিজের হাতে কুকী (খুকী) ঠাকুরঝির জন্য তৈয়ার করিয়াছিলাম। কাল সরকারী বাড়ীর এক ছোকরা (মহেশঠাকুরের বয়স তখন ২৯।৩০, পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ, গলায় একগুচ্ছ উপবীত মালার মতন ঝুলিত) আমার কাছে ইহার দর যাচাই করিতে লইয়া গিয়াছিল। আমি চিনিতে পারিয়া আর ফিরাইয়া দেই নাই। দশ টাকার "খাড়ে" সাত টাকায় রফা করিয়া ২৲ টাকা বায়না স্বরূপ দিয়াছি। তখনি তখনি কিছু না দিলে সে ছাড়ে না, জিনিস লইয়া চলিয়া আসে, হাতে রাখিবার ফন্দীতে দিতে হইয়াছে। আপনি সমস্ত চাকর ডাকিয়া আনুন, আমি সনাক্ত করিয়া দিতেছি, কে চোর।" এই কথা শুনিবামাত্র পিতৃঠাকুরের মনে হইল, "আমার মহেশ ত না? সে যে আমার অনেক দিনের আনীত ও অতি বিশ্বাসভাজন, আমার অন্নে প্রতিপালিত।" পোদ্দারের কথায় তৎক্ষণাৎ

দুই তরফের চাকরে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল ও একে একে রামজয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজনও নহে দেখিয়া পোদ্দার নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, এমন সময় এই লোকারণ্য ভেদ করিয়া সেই আমাকেই ক্রোড়ে লইয়া হঠাৎ মহেশঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, রামজয় পোদ্দার সজোরে তাহার হস্ত ধরিয়া চীৎকারস্বরে বলিয়া উঠিল, "হুজুর এই ঠাকুর আপনার মেয়ের মল চুরী করিয়াছে, ইহাকে কোতোয়ালীতে, থানায় পাঠাইয়া শাস্তি দিন। এমন ভয়ানক কাজ, ছোটছেলের গায়ের গহনা চুরী, মারিয়া যে ফেলে নাই সেই ভাগ্যি।" লজ্জা ও দুঃখে অনেকক্ষণ পিতৃদেব কাহারো মুখের দিকে তাকাইতে পারিলেন না, তাহার পরে মস্তক উঠাইয়া, দয়ার্দ্র করুণহৃদয় পিতা গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কে আছ, মহেশকে পাবনা জেলার সীমানা পার করিয়া দিয়া এস ও মুরশিদাবাদ যাওয়ার পাথেয় দিয়া দাও।" আর মহেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহেশ, তোমার কোল হইতে আমার মেয়ে নামাইয়া দিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি তোমাকে দেখিবার কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার স্নেহ দয়ার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছ।" মহেশঠাকুরকে কোন উত্তর দিবার অবসর দেওয়া হইল না, তখনি চারিজন পাইক আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

সেদিনের মত কাছারী ভাঙ্গিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে এক নিরানন্দের ছায়া পাতে সকলই অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। বিদেশী বালক, অনাথ বালক মহেশ, বাল্যে আমার পিতার আশ্রয়ে মানুষ হইয়া পরিশেষে তাঁহারই কন্যার পায়ের মল চুরী করিয়া এমন একটা তীব্র ব্যথা তাঁহার মনে দিল, যে বহুকাল তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। যখন তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "দরকার ছিল ত আমাকে সে কেন তাহা বলিল না, আমি সাতের বদলে দশই তাহাকে দিয়া দিতাম, সে কেন এমন কাজ করিল?"

সময় যেমন চলিয়া যায়, তেমনি চলিয়া যাইতে লাগিল, আমরাও ক্রমে সব বড় হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই ঘটনার সাত আট বর্ষ পরে প্রচণ্ড আশ্বিন মাসের ঝড়ের পরই আমার বিবাহের মহাধূম পড়িয়া গেল। সে বিবাহ উৎসব রাজসাহী জেলার একটা স্মরণীয় দিন, অশ্বমেধ যজ্ঞ বিশেষ। অনেক কাল তেমন জাঁকের বিবাহ সে অঞ্চলে হয় নাই। নানাদেশ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার লইয়া লোকজন আসিয়া আমাদের ঠাকুরবাড়ীতে কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছিল। যাত্রাওয়ালা, বাদ্যকর, কীর্ত্তনী, বাই, ভাঁড়, বাজিকর এবং বহুবিধ শাল শাড়ী স্কন্ধে কাশী অমৃতসহরবাসীরও অভাব হয় নাই। সিধা বিতরণ ও শতাধিক জনের আহার প্রস্তুত করিতে গৃহের বধূগণ ও গৃহিণীরা পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন। রাজসাহী হইতে হালুইকর ব্রাহ্মণ আনয়নার্থে লোক পাঠান হয়।

যাহারা এ সকল 'সরবরাহ' করিত, এক সঙ্গে অত লোক দিতে না পারায় আমাদেরই ভৃত্যগণ চারিদিকে খোঁজ করিয়া ব্রাহ্মণ সংগ্রহ পূর্ব্বক হরিপুর রওনা হইয়া আইসে। সেই দলের ভিতর যে সেই মহেশদাদা ও তাহার জ্যেষ্ঠ ছিল, তাহা আমাদের লোকেরা চিনিতে পারে নাই।

অপরাহ্ণে জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, জ্ঞাতিকুটুম্বসহ পিতৃদেব আঙ্গিনায় বসিয়া সব তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর "ভিয়ানের" ব্রাহ্মণগণ আসিয়া পৌছিল ও সবাই নমস্কার করিয়া দূরে দাঁড়াইল, কেবল একজন মাত্র আধাবয়সী ব্রাহ্মণ তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে অশ্রুজলে তাহা সিক্ত করায় তিনি চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, চিনিতে পারিলেন না কে। সাত আট বৎসরের দারুণ মানসিক কষ্টে ও অনুতাপে অকাল বার্দ্ধক্যে, তাহার চেহারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে "মহেশদাদা" আর ছিল না। ৩৭।৩৮ বর্ষেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে অতি ধীরে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি আপনার সেই হতভাগ্য মহেশ, পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া আবার আপনারই দ্বারে আসিয়াছি।" পিতৃদেবের হৃদয় মমতায় দ্রবীভূত হইয়া তাঁহারও নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া অন্য সব কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সেই মুহূর্ত্তে মহেশঠাকুরের এই অপ্রত্যাশিত আগমন বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার হইতে না হইতে তখনকার প্রাচীন পরিচারকবর্গ তাহাকে দেখিতে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে এক বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়।

মহেশদাদা কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে চাহিল। পিতৃদেব কোন দ্বিধা না করিয়াই তাহাকে অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ দিলেন, তখন আমি বিয়ের 'কনে' বহির্ব্বাটীতে যাইতে পারি না, আমার পিতৃষসা-ঠাকুরাণীদিগের অনেকেরই চৌদ্দ পনের বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেই একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই বিবাহ হইয়া যায়। আশ্বিনে দশ উত্তীর্ণ, কার্ত্তিকে "শুভপরিণয়", মহেশদাদা প্রাণের আবেগে ও পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দশমবর্ষীয়া আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াই শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, সে আর এক করুণ দৃশ্য। মা পিসিমা প্রভৃতিও তাহার সহিত রোদন করিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে আমরণকাল পর্য্যন্ত মহেশদাদা আমাদের পরিবারে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছে, তেমন বিশ্বস্ত ভৃত্য ও স্নেহশীল সেবক বন্ধু আমাদের আর কেহ ছিল না। তবুও যখন তখন মহেশদাদা গত জীবনের সেই একদিনের ভ্রান্তিকর কার্য্যের কথা ভুলিতে পারে নাই। ভগবান তাহাকে কেন যে এ "কুগ্রহের দৃষ্টি হইতে তখন রক্ষা করেন নাই" সেই তাহার চির ক্ষোভের কারণ ছিল। তাহার দেহ মনের উপর যে অনুশোচনা যুগান্তর আঁকিয়া দিয়া পূর্ণ যৌবন অসময়ে হরণ করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ চিহ্ন সকলেই স্বচক্ষে দেখিয়া কত ব্যথিত

হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং মহেশ ঠাকুরও তাহার নিজ কৃত সেই অবৈধ কার্য্যের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী কালে জীবনসন্ধ্যায় সময়ে সময়ে গোপনে অশ্রুজল ফেলিত, শুনিয়াছি। মনুষ্য জীবনের পাপপুণ্যের বিচার ও সুখদুঃখের অনুভূতি সকলের নিকট এক নহে। একজন হয়ত আজীবন নিত্য লুক্কায়িত পাপ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়া লোকের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ধরা না পড়াই সৌভাগ্য মনে করে, আবার কেহবা একদিনের সামান্য ভুলের নিমিত্ত চিরকাল অনুতাপানলে জলিয়া পুড়িয়া মরে। মানুষে মানুষে ভিন্নতা এই।

পিয়ানো শিক্ষা রহস্য।

আমাদের চৌধুরী বংশের সেকালের দুহিতারা পিতৃগৃহবাসের মৌরসী পাট্টা হস্তে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেন। তাহার মধ্যে আমিও একজন। সে বন্দোবস্তে কাহাকেও কোন সাংসারিক ঝঞ্ঝাট বহিতে হইত না, দিব্য আরামে জীবন কাটিয়া যাইত, কন্যাদায়েও তাঁহাদিগের স্কন্ধে কোনও ভাবনা ছিল না। মেয়েরা সকলে দেখিতে পরম সুন্দরী থাকায় ধনীর ঘরে বিবাহ হইয়া যাইত, ব্যয় মাতামহকে বহন করিতে হইত, উপরন্তু কোন দিকে কিছু ত্রুটি হইয়া যাইলে আবার মান অভিমানের পালায় কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইত। নিঃসন্তান বালবিধবা পিতৃষসাঠাকুরাণীদিগের মধ্যে দুই একজনের একাধিকবার শ্বশুরালয়ে যাওয়া ও বৈধব্য ঘটিয়া সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায় পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী প্রাচীনাদের প্রমুখাৎ আজও শুনিতে পাওয়া যায়। সে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জনসমাজে অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাধ্য হইয়া কুলীন পাত্রে বংশানুক্রমে কন্যাদান করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

শৈশবে আমিও দুই চারি বার শ্বশুর গৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু শ্বশ্রূমাতাকে কন্যা দেখাইতে যাওয়াই আমার শেষ গমন। বিবাহান্তে আমাকে পুত্রদিগের ন্যায় রীতিমতন সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ করিতে পিতৃঠাকুরের একান্ত চেষ্টায় ও যত্নে অনেক মেম নিযুক্ত হইয়া গৃহে আসিতেন। তখন আমরা যশোহরে, মিসেস্ জ্যাক্ (যাহাকে আমাদের বাড়ীতে "ববের মা" নামে ডাকিতেন) আমাকে নানাবিধ শিল্প ও ইংরাজী কথোপকথন শিখাইতেন। তাহার ফলাফল এক্ষণে পূর্ব্বকথায় স্মৃতিমাত্র। আমার ও ভ্রাতা শ্রীমান আশুতোষের বিদ্যাটা বন্ধুগণের মধ্যে অসময়ে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। কেহ আসিলেই আমাদিগকে কবিতা আবৃত্তির জন্য পিতৃদেব আহ্বান করিয়া পাঠাইতেন, আমি হেম বাবু ও মাইকেল দত্ত, আশু সেক্সপিয়ার, শেলী ও বাইরান মুখস্থ বলিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত কি জ্বালাতন করিতাম, তাহা জ্ঞাত নহি, তবে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ছিল না। এখনকার পুত্রকন্যার ন্যায় আমরা কখনই "না, পারি না, মনে নাই"

বলিতে পারিতাম না। আত্মীয় সমাগম হইলেই আমাদের ভ্রাতাভগিনীকে যে ইন্‌তাহাম (পরীক্ষা) দিতে হইবে, সেটা আমরা আগেই জানিয়া প্রস্তুত হইতাম। ক্রমশঃ পদ্য গদ্য "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-শাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে গান বাজনার "মহলা" দিতে হইত। আমার সঙ্গীত শিক্ষার জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ অদ্যাপি আমি "খোস মেজাজে বাহল তবিয়াতে বিদ্যমান"। প্রবল জরাক্রান্ত হইলে অযাচিত-ভাবে অন্য সব উপসর্গ সহ সঙ্গীত আসিয়া এখনও আমার স্কন্ধে ভর করে, সেটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকারী সর্ত্তে প্রাপ্ত।

সেকালে ওস্তাদের সম্মুখে আমাদিগের (মেয়েদের) বাহির হওয়া সম্ভবপর ছিল না, তাহাদের নিকট গান বাদ্য শিক্ষা করা ত একান্ত অসম্ভব ব্যাপার, কাজেই আমার মেম শিক্ষয়িত্রী ছিল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আশু পুস্তক দেখিয়া হারমোনি-য়াম শিক্ষা করিতেন।

আমি কৃষ্ণনগরে প্রথমে আসিয়া রোমান কাথলিক নানদিগের নিকট পিয়ানো শিক্ষার্থে যাইতাম। তাহার পর অশীতি বর্ষীয়া মিস্ টবি হইতে আরম্ভ করিয়া সে সময়ে আমার সমবয়সী কুমারী ডুবাল পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুই বার আমাকে পিয়ানো শিখাইতে আসিতেন। কাশীর রোগীর রোগ পরীক্ষার্থে বিজ্ঞ চিকিৎ-সকগণ যেমন তাহার বক্ষে কল লাগাইয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া এক, দুই, তিন one, two three বলেন ও বলান আমার অঙ্গুলিও সেইরূপ মুক্ত পিয়ানো বক্ষের উপর ঢং ঢং আওয়াজ করিতে করিতে one, two, three গণিত, তালমানের চিহ্ন কোথায়ও পাওয়া যাইত না। চিকিৎসকে বক্ষের ভিতরের ফুসফুসের রোগ নির্ণয় করেন, আর আমি বাদ্যযন্ত্রের ঢং ঢং বাহ্য শব্দের সহিত ঐক্যতানের অমিল ধরিতে পারিতাম না; অথচ অভ্যাস করিতে করিতে অঙ্গুলী অবশ হইয়া যাইত। ক্রমে ঢিমে তেতালায় গড়াইয়া গড়াইয়া ইংরাজী waltz ওয়ালসে যেদিন পৌঁছিলাম, সেদিন আমার শিক্ষয়িত্রী কুমারী ডুবাল নাচিবার নিমিত্ত আনন্দে অগ্রসর হইয়া আমাদিগের বৈঠকখানায় এক বার ঘুরপাক খাইতেই তাল কাটিয়া উচ্চ হাস্যে তিনিও বসিয়া পড়িলেন। আমিও সমস্বরে হাসিতে যোগ দিয়া পিয়ানোর বক্ষ দ্বার চির রুদ্ধ করিয়া দিলাম। সৌভাগ্য বশতঃ দ্বিপ্রহরে গৃহে কেহ থাকিতেন না এবং পুরাকালের ইন্দ্রসভা ছিল না, নতুবা বাদ্যবিভ্রাটে আমাকে শাপভ্রষ্ট হইয়া কোথায় যে এতদিন ঘুরিতে হইত, তাহার ঠিক ঠিকানা থাকিত না। নর্ত্তকীও যে অমনি অব্যাহতি পাইতেন, এমন হইতে পারে না, তবে শাস্তিটা আমারই বেশী হইবার কথা।

পিয়ানো বিদ্যা তো এখানেই শেষ হইয়া গেল, নাম যশ তেমনই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত থাকায় নদীয়ার জজ রিচার্ডসন ও চব্বিশ পরগণার কমিশনার চাপম্যানের পত্নী জেলায় পদার্পণ করিয়াই আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলেন। উভয় মহিলারই খৃষ্ট ধর্ম্মে গভীর বিশ্বাস থাকায় যে কোন প্রকারে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন বঙ্গনারীকেও পরিত্রাণের পথে আনয়ন করিতে পারিলে জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতেন। এই দুই মেম সমাগমে আমরা সকলে সাধ্যানুসারে আদর যত্নের কোনই ত্রুটী করিলাম না। কথাবার্ত্তা ভদ্রোচিত সমাদর সমান ভাবে চলিবার পর ইংরাজ রমণীদ্বয় আমাদের বাজনা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, ভ্রাতা বাঙ্গালা গৎ হারমনিয়ামে বাজাইয়া শুনাইয়া ধন্যবাদ পাইলেন, ভুলচুক ধরিবার কিছু ভয় ত ছিল না, আমার পিয়ানো ইংরাজী পিস্ (piece) বাজাইতে হইলে, যাহা ইচ্ছা তাহা করিলে চলিবে না। বিদ্যার পরিচয় ঠাকুরাণী ডুবাল ইহার পূর্ব্বে খুবই পাইয়াছিলেন (যদিও তখন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে ছাড়েন নাই)। তবুও আমি বাজাইবার জন্য মুক্ত পিয়ানো সম্মুখে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম, তাঁহারা ভাবিলেন, ইয়ং লেডীদিগের স্বভাবই এইরূপ, জানিয়াও সহজে গুণ প্রকাশ করিতে চান না, লজ্জা দেখান, সে যাহা হউক, আমি মহা সমস্যায় পড়িয়া শুক্‌না ডাঙ্গায় হাবুডুবু খাইতেছি, ঠিক সেই সময়েই নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য এবং তুষার শীতল লেমনেড প্রভৃতি আসিয়া পড়ায় বাজনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ততোধিক এক অভিনব বিপদে পড়িয়া গেলাম। সহসা জজ পত্নী সাদরে আমার হস্ত ধরিয়া এক পাত্রে আহারার্থে ডাকিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। তখন আমরা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও স্পৃষ্ট খাদ্য কখনও স্পর্শ করিতাম না। অযাচিত স্নেহে অত্যন্ত ভীতভাবে পিতৃদেবের দিকে চাহিলাম, তিনি ইঙ্গিতে খাইতে আজ্ঞা দিলেন, অগত্যা মেম মহোদয়ার সঙ্গে একত্রে মিষ্টান্ন খাইয়া সেই মুহূর্ত্তে জাতিচ্যুত হইলাম। পিসিমাতারা যবনিকার অন্তরাল হইতে জাতিনাশের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া অতীব ব্যথিত হইয়া সেই দিন হইতে বহুকাল আমার হস্তে ফল ভিন্ন অন্য কোন সামগ্রী আর খাইতেন না এবং নিশীথে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনীয় শয়ন করিতেও দিলেন না। পরদিন অতি প্রত্যুষে স্নানান্তে জাহ্নবীর পবিত্র সলিল আমার মস্তকে, গাত্রে দিয়া ও তাহা পান করাইয়া বাহ্য কতকটা তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে জাতিনাশের ক্ষোভটা চিরকাল রহিয়া গিয়াছিল। সন্তান স্নেহের আধিক্যের নিমিত্ত মুখে কোন দিন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাকে পরে কখনও কিছু বলেন নাই। বড় হইয়া যতবারই সেই সান্ধ্য ঘটনা ও মাতৃসমা স্নেহময়ী পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীদিগের মনে অযথা ক্লেশ দেওয়ার কথা ভাবিয়াছি, ততবার হৃদয়ে বেদনা বোধ হইয়াছে, কখনও বা নেত্রে জলধারা বহিয়াছে। কৈশোরে যাহা কৌতুকাবহ মনে হইয়াছিল, জীবন মাধ্যাহ্নে তাহা আবার অসুখকর ঘটনার ব্যথা স্বরূপ স্মৃতিতে পরিণত হইয়া আছে। মানসিক দুর্ব্বলতা, অপক্ক বুদ্ধি এবং বয়সের দোষে ঐ কাজ করিয়াছিলাম। ইহার মূল কারণ, আমার পিয়ানো শিক্ষার বৃথা ও মিথ্যা যশখ্যাতি

আমাদিগের পিতৃকুলের সকল পুরোহিতেরা শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ, লাহিড়ী; চৌধুরী বংশে বংশপরম্পরায় পৌরোহিত্য করায় "চক্রবর্ত্তী" উপাধি। দলিলপত্র জমা জমীর লেখা পড়ায় "লাহিড়ী" লিখিত হইলেও সর্ব্বসাধারণে "চক্রবর্ত্তী মহাশয়" নামে পরিচিত। কুলীনগণ পূর্ব্বে শতাধিক বিবাহ করিতেন, তাহা একপ্রকার ব্যবসাই ছিল। সেই নজিরানুসারে অতি বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণগণের সন্ধান পাইবামাত্র বয়স্থা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, পিতামহগণ সেই ব্যক্তির সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, বৈতরণীর ঘাটে কন্যা দিয়া অন্তর্জ্জলী করিয়া যাইতেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের পুরোহিতদিগের আদি পুরুষের ভাগ্যে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল।

লাহিড়ী মহাশয়েরা আমাদের গ্রামের অনতিদূরে সালখা নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং এখনও করেন, সেখানে অন্য কোন লোকের বাস ছিল না, কেবল পুরোহিত ঠাকুরেরা আর তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও দাসদাসীর বসতি থাকায়, তাঁহারাই পল্লীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম, টোল চতুষ্পাঠি প্রভৃতিতে বড় সুন্দর ও সৌষ্ঠবময় ছিল। কত বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন, বিদ্যানিধি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ও ছাত্রগণের শাস্ত্রালোচনায় গ্রামটী তীর্থ বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। কালের কবলে সে সকল কীর্ত্তি এখন ধ্বংসপুরে গিয়াছে।

রাজসাহী, পাবনা, গঙ্গাতীরে অবস্থিত নহে, সেইজন্য পূর্ব্বকালের বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে নৌকাযোগে গঙ্গা যাত্রা করিয়া মুরশিদাবাদ যাইতেন।

যাতায়াতে মাসাবধি সময় লাগিত। ঐ অঞ্চলের লোক প্রায়ই সম্পন্ন গৃহস্থ, সঙ্গে দুই চারিখানি বড় বড় পান্‌সী আত্মীয় কুটুম্বে পূর্ণ থাকিত। অভাব কিছু থাকিত না, গুরু পুরোহিতও সহযাত্রী থাকিতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের আদি পুরুষ গঙ্গা যাত্রা করিয়া মুরশিদাবাদ যাইতেছিলেন এবং কোন এক গ্রামের ঘাটে দিনের আহারাদির জন্য নৌকা লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা অচিরাৎ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ায় এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাঁহাকে কন্যাদায় উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের করুণ রোদনে পীড়িত গাঙ্গাযাত্রী চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরুপায়ভাবে অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া সেই দিন নদীতীরে গোধূলিলগ্নে শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন। নববধূ বিংশতিবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী কন্যা অকালে বৈধব্যের সনন্দসহ বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কার যৌতুকস্বরূপ স্ত্রীধন পাইলেন। তাঁহার স্বামী স্বকীয় শ্রাদ্ধের আয়োজনার্থে যজমানদত্ত স্বর্ণ অলঙ্কার বাজু, চুড়ী, পট্টবস্ত্র রৌপ্য ও কাঁসার বাসন এবং মূল্যবান সামগ্রী যাহা কিছু

অভাব সময়ের জন্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার সকলই নবপরিণীতা বধূকে দিলেন। একেবারে রিক্ত হস্তে বৈধব্যের নিদারুণ বহ্নিতে দগ্ধ করিতে তাঁহার মনে দয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় অন্তিম কালের সেই বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রেই তাঁহার বংশ ও নাম রক্ষা হইয়া গেল। এই লাহিড়ী বংশ সেই এক পুরুষের ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর।

এই পুরোহিত মহাশয়গণের পরবর্ত্তী বংশধর ছোটকর্ত্তার কোন সন্তান সন্ততি না হওয়াতে কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই বড় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। গৃহিণী ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি বহু কষ্ট করিয়াও যখন সন্তানের মুখ দর্শনে বিফল মনোরথ হইলেন, তখন স্বামীকে পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার সঙ্কল্পে গোপনে গ্রামে গ্রামে সুন্দরী বয়স্থা কন্যার সন্ধানে নিজ পরিচারিকা পাঠাইতে লাগিলেন ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রীর সমাচার পাইয়া সইএর বাটী ব্রতের নিমন্ত্রণে যাইবার স্বামীর অনুমতি লইয়া তাঁহারই জন্য বিবাহের পাত্রী দেখিতে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া মনোমত "কনে" দেখিয়া একেবারে বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়া স্বামীকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রথম অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ, তাহার পর কান্না-কাটী, অনাহার এবং সকল ত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণেও যখন কোনো ফলোদয় হইল না, তখন গুরুদেবকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা মত করাইয়া লইলেন। সে কালের দিনে ইষ্টগুরুর আদেশ দেবতার দৈববাণীর ন্যায় অলঙ্ঘনীয় ছিল। গুরু আজ্ঞা অমান্য করিবার সাহস কাহারও ছিল না।

পতিকে বিবাহ দিয়া ছোটকর্ত্রী প্রসন্নমনে নব বধূ গৃহে আনিয়া ছোট ভগ্নীর মতন তাহাকে আদর ও যত্নে কাজকর্ম্ম শিখাইলেন এবং তাহাকে বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া পতি সম্ভাষণে পাঠাইয়া আনন্দানুভব করিতেন। প্রত্যহ গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের নিকট যুক্তকরে দাঁড়াইয়া সপত্নীর পুত্র কামনা করিয়া বলিতেন, "ছোট বৌয়ের যেদিন পুত্র হইয়া আমার পূজ্যপাদ স্বামীর আঁটকুড়ে নাম ঘুচিবে, সেদিন আমি আপনাকে একশ আট সোনার তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিব এবং পুত্র জন্মের শুভ সংবাদ যে আনিবে, তাহাকে আমি যে দিকের কাণে শুনিব, সেই অঙ্গের সমস্ত গহনা পারিতোষিক দিব। ঠাকুর দয়া করিও।"

সময় কালীন ছোটবধূর সন্তান সম্ভাবনা হইলে গৃহিণী তাহাকে পরম যত্নে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া করিয়া পাঠাইতেন। পরে মহা সমারোহে সাধভক্ষণ করাইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া প্রত্যহ গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও "সত্যনারায়ণের কথা" দিতে লাগিলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, এমন সময় সপত্নীর পুত্র জন্মের সমাচার আসিয়া পৌঁছিল ও গৃহিণী দক্ষিণ কর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন বলিয়া সেই কাণের কড়ি, পিপুলপাতা, হাতের বাজু কঙ্কণ পৌঁছা ও পায়ের

বাঁকমল খুলিয়া দিলেন এবং ঘরে গিয়া পরিধান বস্ত্র, পাটের শাড়ী, শীতের গাত্রের রেজাই, নিজের বিবাহের পট্টবস্ত্র ও প্রাতঃসন্ধ্যার 'তাম্রকুণ্ড', 'আচমনী' প্রভৃতি পূজার সকল বাসন উপহার দিয়া সানন্দ মনে স্বামীকে বলিয়া কহিয়া সপত্নীর পিত্রালয়ে লোক সহ চলিয়া গেলেন। সূতিকাগৃহে যাওয়া তৎকালে কেন এখনও সে প্রদেশের রীতি নহে, তথাপি পুরোহিত গৃহিণী সে বাধা না মানিয়া একেবারে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া নবজাত শিশুর প্রকৃত মাতা হইয়া জননীর করণীয় সকল কায়মনোবাক্যে করিতে লাগিলেন, যথার্থ মাতা কেবল স্তন্যপান করাইতেন মাত্র।

পুত্রকন্যার জন্মের যে জাতক অশৌচ, তাহাকে আনন্দাশৌচ বলে, তাহাতে জ্ঞাতিগণের আহারাদির কোন পরিবর্ত্তন নাই, কেবল দেবকার্য্য, পূজা ইত্যাদি করিতে পারা যায় না। কন্যার জন্মগ্রহণে মাতা নবপ্রসূতা কন্যার একমাস, আর পুত্রের জন্মে মাতা ও পুত্রের একুশ দিন অশৌচ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রসূতি গৃহান্তরে যাবতে কিম্বা কোন রূপ গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

এই সময় চক্রবর্ত্তী ঠাকুরাণীও সমানভাবে সপত্নী সহিত তেমনি থাকিয়া একুশ দিনে অতি সমারোহে শিশুর ষষ্ঠী পূজান্তে গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সপত্নী ও নবজাত শিশুপুত্রসহ নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া ছোটকর্ত্তাকে দিয়া স্বর্ণ বলয়ে পুত্রের মুখদর্শন করাইলেন। তাহার পর নারায়ণের মানসিকের স্বর্ণ তুলসী দান এবং অন্যান্য সকল দেবার্চ্চনা করিয়া শিশুকে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা প্রয়োজন অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, টোলপাঠ উপনয়ন ও বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার স্ত্রীধনের ব্যয়ে সমুদয় নির্ব্বাহ এবং পরে চতুষ্পাঠী স্থাপন, বিদেশী ছাত্রগণের স্থায়ীরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নীপুত্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিমাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে কখনও জানিতেন না, যে পরলোকাগতা মাতা তাঁহার সৎমা ও "দুদুমা" তাঁহার গর্ভধারিণী। জননীর মৃত্যুশোকে পুরোহিত মহাশয় বহুকাল তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, গয়ায় পিণ্ডদান, মাতৃনামে সরোবর ও কূপ খনন, দেশে সড়ক ও কাশীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইলেন।

বর্ষান্তে শ্রাদ্ধ বাসরে পল্লীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সমুদয় লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া যিনি যাহা খাইতে ভালবাসেন, তদনুরূপ ভোজন করাইলেন। সেই সৎমাতার নাম এখনও আমাদিগের অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রাহিয়াছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। কালের কঠোরাঘাতে কত কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সাধবী, পতিব্রতা, সর্ব্বত্যাগী সৎমাতার অপূর্ব্ব কাহিনী অদ্যাপি তাঁহাদের বংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

এই নারীজীবনের আদর্শে আবার কত বিমাতা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কত সপত্নী-পুত্রকে নিজ গর্ভজাত পুত্রবৎ স্নেহে পালন করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আর আমরা কয়জন রাখি ?

সৎ মেয়ে।

আমার মাতামহ বংশের নূতন করিয়া কি আর পরিচয় দিব ? পূর্ব্ব কথার প্রথমে কতক বলিয়াছি, আবার তাহার উল্লেখ না করাই ভাল। যাঁহারা 'বাঙ্গালীর জমীদার" পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা "ছাতকের বসন্ত রায়ের" অতীত কাহিনী নিশ্চয় অবগত আছেন। সে বংশের পূর্ব্ব গৌরব এক্ষণে ধূলিসাৎ। শ্রীসম্পদ শ্মশানভূমির ন্যায় পড়িয়া আছে, সেই লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিলে চক্ষে কেবল জল আইসে ও ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপাকৃতি ইষ্টক চারিদিকে দেখিলে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। কত দেবমন্দির আজ ভূগর্ভে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই রায় বংশের কনিষ্ঠ বাগে আসিয়া বাস করেন, বড় কাশীনাথ রায় স্বনামখ্যাত কাশীনাথ পুরেই রহিয়া যান। এক ভ্রাতার পাঁচজন বংশধর, সেই বাগ গ্রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন। 'বড় হিস্বার' বড়কর্ত্তার সর্ব্বস্ব যাইয়াও যাহা ছিল, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ অতি সুখেই হইত। পুত্রসন্তান ছিল না, এই যাহা অভাব। তাঁহার একমাত্র কন্যা কাশীশ্বরী দেবী রূপেগুণে অদ্বিতীয়া ও পিতার শূন্যগৃহ আলো করিয়া থাকিলেও আত্মীয়-স্বজনের মনের দুঃখ দূর করিতে পারেন নাই। অপুত্রক রায় বংশের বিষয় সম্পত্তি যে কন্যা প্রাপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহাদের প্রীতিকর বোধ হইত না। কর্ত্তা গৃহিণীকে পোষ্যপুত্র রাখিবার কথা বলিতে সাহস করিতেন না, নীরবে থাকিতে হইত। কন্যা কাশীশ্বরী তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতেন। রায় মহাশয় ঘরজামাতা রাখিয়া দিলেন, কুলীন কুমার ধনীর গৃহে হঠাৎ নবাবীপদ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে, কোন গৃহজামাতা শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিয়া সে রোগ হইতে মুক্তি পান নাই। কাশীশ্বরী বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার অভাব ও রায় বংশের নাম লোপের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ন থাকিতেন ও কি উপায়ে পিতার অপুত্রক দুঃখ দূর করিতে পারেন তাহার জন্য সতত শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া মাতাকে নানারূপ ব্রত-কথা শুনাইতেন। বিবিধ পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞে যখন কোন ফল দর্শিল না, তখন তিনি একদিন সর্ব্বসমক্ষে পিতাকে আবার বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করায় তাঁহার জননী কন্যার এই কথায় হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তাঁহার পিতার সেকথা কর্ণগোচর হইলে, তিনিও বাড়ীর ভিতর আহারাদি করিতে যাওয়া বন্ধ করিলেন, তথাপি কন্যার হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন না। কাশীশ্বরী পিতৃ-দেবের চরণে পতিত হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পরে মাতার পদযুগ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দ্বারাই পিতার মত করাইয়া লইলেন। রায়মহাশয়

কন্যার এই নিঃস্বার্থ কার্য্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারিয়া নীরবে রহিয়া গেলেন। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, প্রৌঢ় পাত্র সপত্নীসহ গৃহবাস, এমন স্থলে কোন পিতামাতা তাঁহাকে কন্যা দিবেন না, কিন্তু "কড়িতে বুড়ার বিয়ে" এক রাত্রেই সম্পন্ন হইয়া গেল। কাশীশ্বরীর চেষ্টায় সর্ব্বসুলক্ষণা বয়স্থা এক কুলীন কন্যাকে তুলিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া বিবাহ দিলেন, বড় গৃহিণী অন্তরে অন্তরে অসন্তুষ্ট হইয়াও লোকলজ্জার ভয়ে সপত্নীকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। নববধূ শ্যামাঙ্গিনী ও দরিদ্র পিতার কন্যা হইয়াও কুলেশীলে বড়কর্ত্রীর সমকক্ষা ছিলেন। কাশীশ্বরী পিতৃদেবকে ধরিয়া বিমাতার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিলেন ও নিজ প্রাপ্য আভরণ সকল ছোটমাকে দিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। নিজ-মাতার অজ্ঞাতে পিতার নিকটে যাইয়া বিমাতার পিতামাতার সাংসারিক অভাব দূর করিতে অর্থ চাহিয়া গোপনে তথায় পাঠাইতেন। মাতা কন্যা একবয়সী থাকায় উভয়ের মধ্যে সখীত্বও ছিল এবং যাহাতে পিতৃকুলের পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষা হয়, তাহার কারণ তিনি সর্ব্বদা যত্নপরায়ণা থাকিতেন। তাঁহার মাতা কন্যার কার্য্যকলাপে আশ্চর্য্য হইয়া সকলকে বলিতেন, "কাশী কোন দেবকন্যা, শাপে আমার গর্ভে জন্ম লইয়াছে, এখন বাঁচিলে হয়।" কাশীশ্বরী স্বীয় জননীর দৈনিক কার্য্যসকল নিজহস্তে করিতেন, কোনদিকে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহা দেখিতেন। বড়কর্ত্তাও বড় পত্নীর প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন, তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিতেন। তাঁহার বাক্যে সমস্ত সাংসারিক ক্রিয়াকাণ্ড, দেবসেবা, অতিথি অভ্যাগতের সমাদর সমানভাবে পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিত। বড় গৃহিণী গৌরাঙ্গিনী, ধনীর দুহিতা ও যৌবনের সহচরী, কর্ত্তার "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী" না হইয়া তাঁহার অনুরাগ ঊর্দ্ধগামীই ছিল। তিনি ছোটবধূকে বালিকাবৎ ব্যবহার করিতেন।

যেদিন কাশীশ্বরীর প্রথম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্ম হইল, সেদিন তিনি হিন্দুর আচার বিচার না মানিয়া একেবারে সূতিকাগহে যাইয়া সদ্যপ্রসূত শিশুকে কোলে লইয়া গ্রামস্থ ও বড়কর্ত্রীর সমুদয় আত্মীয়স্বজন এবং পিতামাতাকে ডাকিয়া পুরস্কার চাহিলেন, স্নানের রৌপ্য গামলা, নাড়ীচ্ছেদের সুবর্ণ 'চোঁচ' ও পরিধানের পট্টবস্ত্র দাবি করিতে লাগিলেন এবং সে সমস্ত প্রাপ্তমাত্র ধাত্রী-মাতাকে দিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

অন্নপ্রাশনের সময় দিব্যকান্তি সুন্দর শিশুর নাম রূপেন্দ্রনারায়ণ রাখিয়াছিলেন। রূপেন্দ্রনারায়ণ বড়মাতার বর্ণশোভা ও দিদির মুখশ্রী পাইয়াছিলেন। ক্রমে দুই পুত্রের জন্ম পরেই বিমাতার বিয়োগে কাশীশ্বরী অতীব শোকাকুলা হইয়াছিলেন। বড়মাতাই পরে সপত্নী পুত্রগণকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। তখন কাশীশ্বরী দেবীরও দুই পুত্রের জন্ম হয়। চারিজনে একত্রে খেলা-ধূলা ও গৃহ-পাঠশালায় অধ্যায়ন করিতেন। বড় শান্তিতে যখন দিন চলিতেছিল,

সেই সময় উপর হইতে বড়কর্ত্তার ডাক আসিয়া পৌছিল, তিনি গঙ্গাযাত্রার পূর্ব্বে গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ও কন্যাকে ডাকিয়া জমিদারীর দুরবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং সমগ্র বিষয়ের চারি অংশ সমানভাগে লেখাপড়া করিতে চাহিলেন। কিন্তু কন্যা কাশীশ্বরী দেবী তাহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বার আনা দুই ভ্রাতার ও চারি আনা দুই পুত্রের নামে লেখাইলেন। জমিদারী পনর ষোল হাজার টাকার, তখনও তাহার উপর গোলাবাড়ী, ক্ষেত খামার, বাগান, পুষ্করিণী, তেজারতী ও জলকর প্রভৃতি লইয়া অনেক সম্পত্তি ছিল। সে সমুদয় ভ্রাতৃগণের নামে দিয়া বাকী চারি আনা পরিমাণ অংশমাত্র পুত্রদ্বয়কে দেওয়াইলেন। আর পিতার লোকান্তর ঘটিলে স্বতন্ত্র গৃহে যাইয়া বাস করিবার জন্য একখানি পাকাবাটী নির্ম্মাণের অর্থ চাহিলেন। গৃহজামাতা থাকা এদেশে বড় অপমানজনক, কাশীশ্বরী পিতৃবিয়োগান্তে নিজগৃহে বাস করিয়া সেই হীনতা হইতে রক্ষা পাইতে পৃথক বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। নিজালয়ে থাকিয়া নিত্য নিয়মিত ভ্রাতৃগণের হিতার্থ আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া অকাতরে সকলই করিতেন ও ভ্রাতৃগণপ্রাণা ছিলেন। তাঁহার কুলীন স্বামী পত্নীর এই অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার ও উদারতার মূল্য বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাকে অত্যন্ত নির্ব্বোধ মনে করিতেন ও কত প্রকারে বাক্যযন্ত্রণা দিতেন। কাশীশ্বরী সে কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। বয়স্যগণের নিকট হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেন ও তাহাতে মনের শান্তি পাইতেন এবং পিতৃবংশ রাখিয়া রায় মহাশয়গণের নাম রক্ষা করিতে ভগবান যে তাঁহাকে সক্ষম করাইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার চরণে কোটী কোটী কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। রায় বংশের সেই 'বড় হিসার' বংশধরগণ আজও কাশীশ্বরীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া বাগ গ্রামের সম্মানরক্ষা করিতেছেন। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি আমরা সেই আদর্শ জীবনের অলৌকিক অমর কাহিনী অদ্যাপি মাতৃমুখে শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকি।

সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচিতি

কবি ও কথাশিল্পী প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম প্রাক্তন রাজশাহী জেলার (পরে পাবনা) অন্তর্গত হরিপুর চৌধুরী জমিদার বংশে—বাংলা ১৪ আশ্বিন ১২৬৪ (ইংরেজি ১৮৫৭ অকটোবর) তারিখে। প্রসন্নময়ী পিতা দুর্গাদাস চৌধুরীর প্রথমা কন্যা। তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে আছেন—হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী, কর্নেল মন্মথনাথ চৌধুরী ও বাংলাসাহিত্যে খ্যাতনামা সনেটশিল্পী ও 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কৃতী পুরুষ। কিংবদন্তি অনুসারে প্রসন্নময়ীর মাতামহ বংশ, বাগকাশীনাথপুরের রায়েরা, বাংলার বার-ভূঁইঞার অন্যতম এবং বংশমর্যাদায় তাঁরা বারেন্দ্র সমাজে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। পিতামহীর সহোদরা ছিলেন নাটোরের মহারানী কৃষ্ণমণি। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী প্রসন্নময়ীর বাল্যজীবন ছিল আনন্দময়। সেকালে স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন না থাকলেও হরিপুরের চৌধুরী বংশের কর্তারা পরিবারের মেয়েদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেন নি। এমন কি প্রসন্নময়ীর পিসিমারা গৃহ-শিক্ষকের কাছে রীতিমতো বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন এবং প্রসন্নময়ী ও আশুতোষের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের পিতা স্বয়ং।

অতঃপর বংশগত প্রথানুসারে মাত্র ১০ বছর বয়সে প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয় পাবনার গুণাইগাছা গ্রামনিবাসী মুখ্যকুলীন কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরে স্বামী উন্মাদ রোগগ্রস্ত হওয়ায় প্রসন্নময়ী পিতৃগৃহে এসে বাস করতে থাকেন। এইভাবে অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হওয়ায় স্নেহশীল পিতা স্বয়ং কন্যার বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার দায়িত্ব নেন এবং ইংরেজি শিক্ষা ও গান বাজনা শিক্ষার ভার দেন এক বিদেশিনী শিক্ষিকার হাতে। ক্রমশ তিনি বাংলা গদ্য-পদ্য রচনায় আকৃষ্ট হন এবং আর্য্যদর্শন, ভারতবর্ষ, মাতৃমন্দির, মানসী ও মর্ম্মবাণী ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাত্র ১২-১৩ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ-আধ-ভাষিণী' (১২৭৬ সাল/১৮৭০ খ্রী.) প্রকাশিত হয়। এই প্রথম কাব্য ও তৃতীয় কাব্য 'বনলতা' (১২৮৭/১৮৮০ খ্রী.) বই দু'খানি তাঁর পিতার নামে উৎসর্গীকৃত। অতঃপর তাঁর পূর্ব্বস্মৃতি, বনলতা, নীহারিকা (২ খণ্ড), আর্য্যাবর্ত্ত, অশোকা ইত্যাদি গদ্য ও কবিতার বই প্রচারিত হয় এবং পাঠকসমাজে যথোচিত সমাদৃত হয়। প্রসন্নময়ীর গদ্য ও কবিতার বিশেষত্ব হল একটি সরল মাধুর্যপূর্ণ ভঙ্গি ও স্বাদ। তাঁর গদ্য রচনার ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কবি প্রসন্নময়ী বিচিত্র বিষয়ে খণ্ডকাব্য রচনা করেছিলেন। অদৃষ্টের অমোঘ বিধানে তিনি জীবনের প্রথম পর্বেই দুঃখকষ্টের যে নির্মম আঘাত পেয়েছিলেন, সেকথা

তাঁর কাব্যের মধ্যে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসন্নময়ীর বেদনাময় জীবনের অবসান ঘটে সুদীর্ঘ ৮২ বছর বয়সে—২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ সালে। তাঁর একমাত্র কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীও (১৮৭১-১৯৩৫) বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় লেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা।

সুদীর্ঘ ৮২ বছরের জীবনে প্রসন্নময়ীর মুদ্রিত বইপত্রের সংখ্যা মাত্র ৯ খানি—কাব্য ৪ খানি ও গদ্য ৫ খানি। আর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কিন্তু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিছু গদ্য-পদ্য রচনা। অপ্রকাশিত রচনাবলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল—আশুতোষ চৌধুরীর জীবনকথা, 'মাতৃমন্দির' পত্রিকায় মুদ্রিত। প্রকাশকাল অনুসারে তাঁর মুদ্রিত বইগুলির নাম যথাক্রমে—১. আধ-আধ-ভাষিণী (কাব্য, ১২৭৬ সাল/১৮৭০ খ্রী.), ২. পূর্ব্বস্মৃতি (গদ্য, ১২৮২/১৮৭৫), ৩. যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন (কাব্য, ১২৮২/১৮৭৫), ৪. বনলতা (কাব্য, ১২৮৭/১৮৮০), ৫. নীহারিকা (কাব্য, ১ম ভাগ ১৮৮৪/২য় ভাগ ১৮৯৬), ৬. আর্য্যাবর্ত্ত (ভ্রমণকথা, ১২৯৫/১৮৮৯), ৭. অশোকা (উপন্যাস, ১২৯৬/১৮৯০), ৮. তারা-চরিত (গদ্য, ১৩২৪/১৯১৭), ৯. পূর্ব্ব কথা (আত্মজীবনী ১৩২৪/১৯১৭)।

প্রসন্নময়ীর রচনাবলির কয়েকটি বিশিষ্ট দিক হল—শতবর্ষ পূর্বের সমাজচিত্র ও সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ, নারীজাতির কল্যাণচিন্তা, প্রকৃতিচেতনা ও প্রকৃতিপ্রেম এবং স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে আছে তাঁর বেদনাবিদ্ধ জীবনের প্রশান্ত ভাবযুক্ত সরল ও সহজ ভাষা, অনাড়ম্বর শব্দসম্পদ আর মার্জিত প্রকাশভঙ্গি। মনীষী রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর অন্যতম এক গুণমুগ্ধ পাঠক—প্রসন্নময়ীকে মুগ্ধ স্বীকৃতি দিয়েছেন 'মা' বলে। সমকালীন ক্যালকাটা রিভিউ, ইণ্ডিয়ান মিরার, ইণ্ডিয়ান নেশান ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রসন্নময়ীর রচনাগুণের আন্তরিক স্বীকৃতি প্রচারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাঁর 'বনলতা' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে সেদিন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে বলা হয়েছিল প্রসন্নময়ীর কাব্য যেন বিগতদিনের জাতী-যূথী-মল্লিকা ও মালতীর স্নিগ্ধ ও মনোরম সুরে নিষিক্ত ("…poems on a variety of subjects which bear the impress of a mind emancipated from the thraldom of Jati, Juthi, Mallika, Malati of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful, the grand and the sublime not simply *in terrestial* objects, but likewise in the phenomenal aspects of Nature, in all her immensity." প্রসন্নময়ীর সমগ্র রচনাবলির মূলসুর সম্পর্কেও একথা সমান প্রযোজ্য।

প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বশেষ রচনা আমাদের আলোচ্য 'পূর্ব্ব কথা' প্রথম প্রচারিত হয় বাংলা ১৩২৪ সালে (১৯১৭ খ্রী.)।

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে রচনাটি কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়—১৩১৯ আশ্বিন থেকে ১৩২০ কার্তিক পর্যন্ত মোট ১৪টি সংখ্যায়। অতঃপর গ্রন্থপ্রকাশকালে 'পূর্ব্ব কথা'র সঙ্গে একটি 'পরিশিষ্ট' যুক্ত হয়। প্রকাশকালে লেখিকার বয়স ৬০ এবং বইখানি তাঁর মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত। এই উৎসর্গপত্রের মধ্যেও বইখানির নামকরণের একটা 'জীবন্ত' যোগাযোগ আছে। উৎসর্গপত্র, যথা: "মা, তুমিই জীবন্ত 'পূর্ব্ব কথা', তবুও আবার আমি তাহা কাগজ কালি কলমে লিখিয়া তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া শ্রম সার্থক জ্ঞান করিলাম। প্রণত কন্যা প্রসন্নময়ী। 'তারাবাস' ২রা জানুয়ারী, ১৯১৭।"

আলোচ্য 'পূর্ব্ব কথা' প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রাদির পরিচয়: "পূর্ব্ব কথা। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। কলিকাতা, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৩২৪ সাল। মূল্য ৷৷৹ আনা। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।" (আখ্যাপত্র, উৎসর্গ ইত্যাদি [৩], ১৮৭ পৃ.; কাগজের মলাট)।

লেখিকার পারিবারিক ও আত্মচরিতকথামূলক রচনা হলেও বইখানি সমকালীন সামাজিক চিত্রের উপভোগ্য একখানি বিশিষ্ট দলিল স্বরূপ। প্রথম প্রকাশের সুদীর্ঘ ৬২ বছর পরে 'এক্ষণ' ১৩৮৬ শারদীয় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণের এবং বর্তমানে গ্রন্থাকারে পুনঃপ্রকাশের এটাই বোধ করি অন্যতম কারণ ও সার্থকতা। কিন্তু সমকালীন পত্র-পত্রিকায় এই বইখানি তেমন গুরুত্ব-সহকারে যথোচিত আলোচিত হয় নি। সেদিনের বাংলার জনপ্রিয় সাময়িকপত্র 'প্রবাসী'তে (১৩২৪ চৈত্র/পৃ. ৬০৪) প্রকাশিত মাত্র দু'লাইনের একটি বিজ্ঞপ্তি একথার বড় প্রমাণ: "পূর্ব্ব কথা। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী। দাম ৷৷৹ আনা। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট। সেকালের সামাজিক চিত্রের সরস বই।"

যদিও সেকালের রচনানির্বিশেষে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবু আত্মকথার বর্ণনা প্রসঙ্গে শতাধিক বর্ষ পূর্বের বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয়মূলক রচনাগুলি এবং বিশেষত আলোচ্য 'পূর্ব্ব কথা' রচনাটি একালের সমাজ-সচেতন পাঠকের কাছেও সমান উপভোগ্য। তাই, মূলত কবির পারিবারিক ও আত্মচরিতকথামূলক রচনা হলেও বইখানি একাধারে সেকালের সামাজিক তথ্যসমৃদ্ধ এক অসাধারণ রচনা, একথা অনস্বীকার্য। এছাড়া, যে বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ স্বাদ ও ভঙ্গিযুক্ত গদ্য-পদ্য রচনার দ্বারা প্রসন্নময়ী বাংলা সাহিত্যের সেবা ক'রে গেছেন, তারই প্রসন্ন স্বাক্ষর রয়েছে আলোচ্য 'পূর্ব্ব কথা'র সর্বাঙ্গে।

রচনাটির শুরুতেই লেখিকার সেই স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক সুর যেন আপনমনে বেজে উঠেছে তানপুরার ধুয়ার মতো; "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

আমাদের গ্রামের আদি নাম কি তাহা জানি না ও একণে জানিবারও কোন উপায় নাই। স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী পিতৃস্বসাগণ এখন লোকান্তরে, কুলপুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগেরও বংশলোপ হইয়াছে। শিবরাত্রির সলিতার মত যে দু'একজন আছেন, তাঁহারা ইংরেজীনবিশ, সুতরাং অতীতকথা অতীত, স্মৃতির সহায়ে যাহা মনের মধ্যে তোলপাড় করে তাহাই লিখিতেছি। আমার পূর্ব্বপুরুষ শাক্ত, পূজা হোম বলি তাঁহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। হরি মৈত্র ও মৈত্রের পুত্র যাদবানন্দ চৌধুরী ['যাদুকীর্ত্তনে'] চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ তাঁহাদের শিষ্যত্বগ্রহণ পূর্ব্বক গ্রামের নাম 'হরিপুর' রাখিয়াছিলেন। আমার পিতৃগৃহ এখনও সেই স্মৃতিময় হরিপুরেই। তাহার পূর্ব্বের সব ভগ্নাবশেষ এযুগেও আমাদের নিকট তেমন মর্ম্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ।" (পৃ. ১)

অতএব সেই মর্মস্পর্শী ও সুখপ্রদ স্মৃতি তোলপাড়-করা কবির পরিজন ও পরিবেশকথা স্বভাবতই আবেগমধুর নস্টালজিয়ার আমেজে মনোহারী। এবং রচনার মধ্যে দেশকাল ও সমাজের যে অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে তা যেমন উপভোগ্য তেমনই তুলনাহীন। যদিও রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও শ্রুতি-স্মৃতির দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তবু তা সামগ্রিক ব্যাপ্তির তুলনায় উপেক্ষণীয়। যেমন, সিপাহি বিদ্রোহের বছরে (১৮৫৭ খ্রী.) তাঁর জন্ম, এবং তখন তিনি কোলের শিশুমাত্র হলেও স্মৃতিভারে বিভ্রান্ত লেখিকা শিশুসুলভ নির্দোষ ভঙ্গিতে লিখেছেন: "সিপাই বিপ্লবের সময় আমি যে ঠিক কত বড় তাহা জানি না। তবে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীগণ যৎকালে উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইতেছে, জনসাধারণ তাহাদের ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারে না, সেই দুর্দ্দিনে আমরা নৌকাযোগে মাতামহালয় [পাবনা] হইতে পিত্রালয় হরিপুর ফিরিবার পথে শুনিলাম সিপাইরা সব আরোহীর নৌকা আক্রমণ করিয়া যাহা কিছু পাইতেছে তাহাই লুঠ করিতেছে।" (পৃ. ২৮)

এই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে 'পূর্ব্ব কথা'য় আমরা যা পাই তা যেন মূর্তিমান স্মৃতিকথার অমূল্য রত্নভাণ্ডার। গ্রন্থসূচনায় বংশ পরিচয়ের পরই কুলীন সমাজ ও লৌকিকতার দোষগুণ থেকে শুরু ক'রে পরিশেষে সৎমা-মেয়ের কথা পর্যন্ত কত বিচিত্র কাহিনী লেখিকা আমাদের যে শুনিয়েছেন তা যেন আর ফুরোয় না। তাঁর অফুরন্ত স্মৃতির ঝাঁপি থেকে লেখিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন একে একে সেকালের ইতিহাসমণ্ডিত কত বিচিত্র কথা: সামাজিক ও লৌকিক দোষগুণ, সেকালীন কলকাতা ও নৈহাটি যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের নামধাম, বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ, ইংরেজি ও মুসলমানী আদবকায়দা, পলাশির যুদ্ধ ও পরাধীনতা, ঠগীর হাঙ্গামা ও গামছা-মোড়ার অত্যাচার, ফকিরচাঁদ রায়ের সময়ে বাংলার প্রাচুর্য, সিপাহি বিদ্রোহ ও অত্যাচার, গঙ্গাযাত্রা ও গঙ্গাধর কবিরাজের দূরদর্শিতা, লাঠিয়াল ডাকাতের ভক্তি

ও স্বামাবিষয়ক গীতচর্চা, কৃষ্ণনগর-বনগ্রাম-মুর্শিদাবাদ-রাজশাহীর পরিবেশ, শৈশবের ব্রতকথা ও খেলাধূলা, নষ্টচন্দ্র ও যাত্রাগান, গোবিন্দ-মধুকান-লোকাযোগা প্রমুখ যাত্রাওয়ালার পরিচয়, জালেশ্বরের হাঙ্গামা, বিবাহ ও বেদনাময় দাম্পত্য জীবন, যশোহর ও হরিপুরের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসরে যোগদান, ঈশ্বর গুপ্তের বংশধর জনৈক বৈষ্ণরাজ ও সংস্কৃত শিক্ষকের বিস্তাবত্তা, পিতার গৃহশিক্ষকতা, দীনবন্ধু মিত্রের বিশেষ অভিনয়ে অংশগ্রহণ, বাল্যবিধবার একাদশী পালন, কলির ভীম কালীকান্ত চৌধুরীর পরিচয়, দোষীর শাস্তির দাবিতে গ্রামবাসীর ধর্মঘট, 'একঘরে' ব্যক্তির দুর্গতি ও আদালতের আশ্রয় ভিক্ষা, মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর পরিচয়, ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন, বালিকাবধূর লেখাপড়া ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা, শেলি-বায়রন-ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠ, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলি পাঠ, স্বরচিত প্রথম কাব্যপ্রকাশ, কালোচিত স্ত্রীশিক্ষা ও মানমর্যাদা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রে যোগদান, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব ও বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা, নাট্যাচার্য অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির পরিচয়, উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' নাটক, শিল্প-সাহিত্য ও সংগীতের চর্চায় পিতার উৎসাহদান, কৃষ্ণনগরের বসন্তমেলা, নবগোপাল মিত্রের স্বদেশীদল, পাটনার প্রসন্ন সিংহের আর্তসেবা, মজঃফরপুরের কেদারবাবুর বদান্যতা, স্যার অ্যাশলি ইডেনের অভ্যর্থনামূলক সান্ধ্য সমিতি, জীবিতের কাম্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, আশুতোষ চৌধুরীর ইংল্যাণ্ড গমন উপলক্ষে একঘরে হওয়া ও প্রায়শ্চিত্ত, আশুতোষের সঙ্গে জাহাজে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক, লেখিকার জন্মদিনে 'পূর্ব্ব কথা' সমাপ্তি উপলক্ষে কাব্যরচনা ইত্যাদি ; অতঃপর 'পরিশিষ্ট' অধ্যায়ে আছে দেবদেবীর মাহাত্ম্যযুক্ত কাব্য ও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, গ্রাম্য রমণীদের লেখাপড়া, লৌকিক কাব্য-উপন্যাস ইত্যাদি পাঠ, খাঁটি দুধ-ঘি-ছানার কথা, গৃহস্থ বাড়িতে ক্রীতদাস-দাসী নিয়োগ, মাস-মাহাত্ম্য ও ব্রতপালন, যাত্রাওয়ালা ও বাজিকর-কীর্তনীয়া-ভাঁড়-বাজিকর পরিচয়, পিয়ানো-শিক্ষা রহস্য, হেমচন্দ্র-মধুসূদন পাঠ এবং সৎমা ও মেয়ের বিচিত্র কথা ইত্যাদি।

এই সমস্ত টুকরো স্মৃতির বিচিত্র কাহিনী এখনো আমাদের মনকে দোলা দেয়, বিশেষত কতকগুলি ঘটনা তো আজও রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক। যথা : রাজশাহী-কলিকাতা যাতায়াত (পৃ. ৬), বাংলা পাঠ্যপুস্তক (পৃ. ৭), গামছা মোড়ার দল (পৃ. ৯), ফকিরচাঁদ রায়ের সময়কার প্রাচুর্য (পৃ. ১৩), গঙ্গা লাভার্থে মুরশিদাবাদ গমন (পৃ. ১৬), স্ত্রী একজোড়া চটি জুতা (পৃ ১৮), লাঠিয়াল ডাকাতের ভক্তি ও শ্যামাবিষয়ক গীতচর্চা (পৃ. ১৮-১৯), ধনীর পুত্রদের লাঠিখেলা ও সড়কী-বন্দুক চালনা (পৃ. ২০), শুভ সংবাদ বহন ও পুরস্কার লাভ

(পৃ. ২২), গহনা পরা ও সাজসজ্জা (পৃ. ২২-২৩), নষ্টচন্দ্র অনুষ্ঠান (পৃ. ২৫), পুরনারীগণের কালী প্রতিমা দর্শন (পৃ. ২৬), সধবার মৃত্যু (পৃ. ৩১), সাহিত্যানুরাগী বন্ধুগণের আসর (পৃ. ৪২), মহিলাদিগের মুখের উপর সুখ্যাতি করা (পৃ. ৪৩), ম্যালেরিয়া জ্বরে ঔষধপথ্য (পৃ. ৫১-৫২), মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর (পৃ. ৫৮), গ্রন্থকারগণের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টিপাত (পৃ. ৬০), সেকালে বিলাত যাত্রা ও প্রায়শ্চিত্ত (পৃ. ৬৯), গ্রাম্য রমণীদের লেখাপড়া (পৃ. ৮১), হাতে খড়ি ও গ্রাম্য রূপকথা শ্রবণ (পৃ. ৮১-৮২), সেকালের খাঁটি ঘি-দুধের দাম (পৃ. ৮২), গৃহস্থের ঘরে ক্রীতদাস-দাসী নিয়োগ (পৃ. ৮৩) ইত্যাদি। বলতে গেলে বইখানির আগাগোড়াই এরকম বিচিত্র ঘটনায় ঠাসা, এগুলি তার উপভোগ্য নমুনা মাত্র।